উত্তরলিপি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৫৮

প্রকাশক :
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদ :
জয়ন্ত চৌধুরী

মুদ্রক :
দয়ারানী পাল
জি. এণ্ড পি. প্রিণ্টার
৩৭ নং বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ এক ॥

ঘুমটা ভেঙে গেল সুনন্দর।

কলিং বেলটা একটানা বেজে চলেছে। যতই বেল বাজুক, বাকী সারাটা রাত ধরে বেল বাজুক—সুনন্দ জানে বাহাদুরের ঘুম ভাঙবে না। বাহাদুর নয়, যেন রায়বাহাদুর।

ঐ ধরনের ছোটখাট এবং তুচ্ছ ব্যাপারে কোনদিনই রাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না শ্রীমান বাহাদুরের।

সে কারণে কম গালাগালি করে নি সুনন্দ বাহাদুরকে। কিন্তু শ্রীমান বাহাদুরের হচ্ছে সেই পলিসি, যত খুশি বলে যাও—কানে আমি শুনলে তো।

কানমলা খেলেও হাসবে, তাড়িয়ে দিলেও হাসবে, ও যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই জেনে বসে আছে। সুনন্দর গৃহে তার স্থিতিটা চিরস্বত্বে কায়েমী হয়ে গিয়েছে।

মৌরসী মোকররী স্বত্ব। সে স্থায়ীত্ব থেকে তাকে নড়াবে এমন সাধ্য নেই কারো। তাছাড়া সুনন্দর গৃহে 'কারো' বলতেও তো সে-ই একা—একমেবাদ্বিতীয়ম্—চাকর বাকর ইত্যাদিরা বাদে।

ব্যাচিলার মানুষ ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়।

একটি উৎকলবাসী পাচক, একটি বুড়ী ঝি সারদা ও ভৃত্য বাহাদুর। কিন্তু না, বেলটা থামার নাম নেই, থেকে থেকে বেজেই চলেছে।

শীতের রাত্রে আরামদায়ক শয্যা ছেড়ে, লেপের ভিতর থেকে উঠতে কি সহজে মন চায়।

কিন্তু না উঠে উপায়ই বা কি, কে জানে কেউ কোন জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে কি না।

শয্যা থেকে উঠে ফ্লানেলের গরম ড্রেসিং গাউনটা খাটের পাশ থেকে টেনে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতেই হলো সুনন্দ রায়কে।

কলিং বেলটা তখনো থেকে থেকে বাজছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে প্যাসেজের আলোটা জ্বেলে দিল সুনন্দ এবং এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিল।

কে ? রুক্ষকণ্ঠেই কতকটা যেন আগন্তুকের মুখের পরে তাকে না দেখেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে যেন থমকে দাঁড়াতে হলো।

যে রুক্ষ বিরক্তির স্বরটা তার কণ্ঠে মুহূর্ত পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল সেটা যেন একটা ঢোক গিলেই সামলে নেয় সুনন্দ।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনবতী এক মহিলা।

রাস্তার মোড়ের গ্যাস-পোষ্টের আলোর খানিকটা আগন্তুক অবগুণ্ঠনবতী মহিলার গায়ের এক দিকে ও অবগুণ্ঠনের ওপর এসে পড়েছে।

কে ?

অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হলো না, কিন্তু মৃদু নারীকণ্ঠ শোনা গেল, তুমিই কি ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায় ?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে ? কি চান ?

প্রথমেই একজন অপরিচিতার মুখে তুমি সম্বোধনে একটু বিস্ময় লেগেছিল যেন ওর।

তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল। আগন্তুক মহিলা আবার বললেন।

কি দরকার ?

বিশেষ দায়ে পড়েই এই অসময়ে, এত রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করতে হলো। কিন্তু উপায় ছিল না বলেই—

শীতের মধ্য রাত্রির কনকনে হাওয়ায় চোখমুখে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। বাইরের দাঁড়িয়ে থাকা একপ্রকার অসম্ভব।

সুনন্দ তাই বলে, ভিতরে আসুন—

দ্বিতীয় আর কোন বাক্যব্যয় না করে সুনন্দর আহ্বানে আগন্তুক মহিলা দরজাপথে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করে আলোটা জ্বেলে দিয়ে আগন্তুক মহিলাকে সুনন্দ বললে, আসুন—

ঘরটি ছোট হলেও রুচিসম্মত আসবাব-পত্রে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিস্তৃত। চারিদিককার জানলার পাল্লা বন্ধ থাকায় ঘরটার মধ্যে বেশ একটা উষ্ণ ভাবই ছিল।

আগন্তুক মহিলার দিকে এতক্ষণে ভাল করে তাকাল সুনন্দ।

মুখটা নীচু করেই ছিলেন মহিলা। বেশ লম্বা ও দোহারা চেহারা। পরিধানে

সরু কালাপাড় ধুতি। পায়ে চপ্পল আছে অবিশ্যি, কিন্তু দামী ঘাসের শৌখীন চপ্পল। ঐ চপ্পল পায়ে কেউ কখনো ঘরের বাইরে যায় না। বাড়ির মধ্যে তো বটেই—সাধারণতঃ বেডরুমে ঐ চপ্পল ব্যবহৃত হয়। চপ্পলের সঙ্গে আরো দেখা যাচ্ছিল সুন্দর গৌরবর্ণ দুখানি পায়ের সামান্য একটুখানি।

গৌরবর্ণ ভারী সুন্দর দুটি বাহু। মণিবন্ধে একটি করে সরু সোনার রুলি।

আর কোন অলঙ্কারই নেই। পরিধেয় বস্ত্রের ওপর দামী সাদা একটি সরু পাড় কাশ্মিরী শাল। সমস্ত চেহারায়, বেশ-ভূষায়, এমন কি বসবার ভঙ্গিটিতে পর্যন্ত যেন একটা আভিজাত্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে বেরুচ্ছিল।

আগন্তুক মহিলার মুখের দিকে তাকালেই কেমন যেন আপনা হতেই শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসে।

চেয়ে চেয়ে দেখে সুনন্দ। এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করে:

আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

যেমন প্রথম থেকে মুখ নীচু করে ছিলেন মুখ নীচু করেই বললেন আগন্তুক মহিলা, পরিচয় দিলেও তো তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।

এতক্ষণে আগন্তুক মহিলা হাত তুলে তাঁর গুণ্ঠন খানিকটা উন্মোচন করলেন এবং পূর্ববৎ মুখখানা নীচু করেই বললেন, তুমি আমার ছেলের বয়সী, তাই তুমি বলেই কথা বলছি, কিছু মনে করছ না তো?

না, না—

কিন্তু পলকহীন দৃষ্টি তখন ঐ উন্মোচিত-গুণ্ঠন মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায়। বয়স হয়েছে মহিলার নিঃসন্দেহে, বয়সের ছাপও কপালে, চোখে-মুখে এবং সিঁথির দুধারের চুলে আঁকা। সিঁদুরহীন সিঁথি ও কপালের মধ্যস্থল।

কিন্তু বয়স হলে কি হবে, অমন স্নেহ-ঢলঢল টানাটানা দুটি চক্ষু, সুন্দর ছোট্ট কপাল, ইতিপূর্বে বড় একটা যেন চোখে পড়ে নি সুনন্দর জীবনে।

গলায় একগাছি সরু সোনার হার চিক্‌চিক্ করছে।

কে আপনি?

বললাম তো, পরিচয় দিলেও তুমি চিনবে না। তবে যে কথা বললে চিনতে পারবে, সেটুকু পরিচয় অবশ্যই দেবো। আর দেবো বলেই যখন এসেছি—

কোমল হলেও ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর মহিলার।

একটু থেমে বললেন মহিলা, গত ২৪শে অক্টোবর যাকে তুমি ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারে মণি-নিবাসে ধরেছ—

কে! কার কথা বলছেন? যেন চমকে ওঠে সুনন্দ রায়, মঙ্গল। মঙ্গলের কথা বলছেন?

হ্যাঁ—

কিন্তু আর সঙ্গে আপনার কি? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে বাঙ্গালী আপনি—কিন্তু মঙ্গল, সে তো ইউ. পি.-র লোক।

না। সে ইউ. পি.-র লোক নয়।

কি বলছেন আপনি! তদন্ত করে তার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—পুলিস-রেকর্ডে তার যে পরিচয় আছে—

যাই থাক না কেন, সত্যি নয়। তার সে পরিচয় সত্যি নয়।

সত্যি নয়!

না। ওর আসল নাম মঙ্গলও নয়। আর, সব কথা তুমি একদিন জানতে পারবে বলেই বলছি—

জানি, মঙ্গলও নয়—আসল নাম ওর যমুনাপ্রসাদ। আবার বলে সুনন্দ।

না। সেটাও আসল নাম নয় ওব। ও বাঙ্গালী। আসল নাম ওর হীরক চৌধুরী। বহুমানী এক জমিদার বংশের সন্তান।

ও। তা আমি—। অতঃপর কি যে বলবে সুনন্দ বুঝে পায় না।

সংবাদটা সুনন্দর কাছে শুধু অচিন্তনীয়ই নয় আকস্মিকও বটে।

দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল মঙ্গল সিং—সে ইউ. পি.-র লোক নয়! তার নাম যমুনাপ্রসাদও নয়! আসলে সে লোকটা একজন বাঙ্গালী। এতকাল তাহলে পুলিস ক্রিমিন্যাল মঙ্গল সিংয়ের যে পরিচয় জেনে এসেছে তা মিথ্যা।

লোকটা বাঙ্গালীই। শুধু বাঙ্গালীই নয়—এক অভিজাত জমিদার বংশেব সন্তান। জমিদার বংশের সন্তান আজ ক্রিমিন্যাল। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায় সুনন্দর। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল সুনন্দ আগন্তুক মহিলার মুখের দিকে।

আরো একটা কথা—। মহিলা পূর্ববৎ মুখ নীচু করেই কথা বলে চলেছেন:

বর্তমানে ওর যে চেহারা, সেও ওর আদি ও অকৃত্রিম চেহারা নয়।

তবে?

তোমরা জান কিনা জানি না, আজ থেকে চার বছর আগে একটা স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে গোলমালে অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ ফেটে গিয়ে ওর এক সহকারীর মৃত্যু হয় আব. ওর ডান দিককার মুখটা ও ডান হাতটা পুড়ে যায়।

তারপর?

অবাক বিস্ময়ে যেন শুনতে থাকে সুনন্দ রায় ভদ্রমহিলার কথাগুলো।

ভদ্রমহিলা আবার বলতে শুরু করেন, সকলেই জানল সেই দুর্ঘটনায় যমুনাপ্রসাদ মারা গিয়েছে—

জানি, মারা যে যায় নি তা আমরা আটমাস বাদে জানতে পেরেছিলাম। সুনন্দ বলে।

হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা বলেন, সে যাই হোক, চারমাস পরে যখন সে আবার সুস্থ হয়ে উঠলো, মুখের চেহারাটা ওর সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে তখন। যমুনাপ্রসাদকে তখন আর চেনবার উপায় নেই। তারপরই ও চলে যায় লক্ষ্ণৌতে—এবারে ওর নাম হলো মঙ্গল।

কিন্তু আপনি এসব কথা জানলেন কি করে? আপনি কি ওকে আগে থাকতেই চিনতেন?

তার সব কথাই যে আমি জানি।

জানেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেমন করে?

কেমন করে জানলাম ওর সব কথা, তাই না?

হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা মাথাটা নীচু করলেন।

সুনন্দ স্পষ্টই বুঝতে পারে কি একটা ভিতরে ভিতরে যেন চাপবার চেষ্টা করছেন উনি।

সুনন্দ চেয়ে থাকে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে নিঃশব্দে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন ভদ্রমহিলা মুখখানা তুললেন, সুনন্দ স্পষ্ট দেখতে পেল দুটি চোখ তাঁর উদ্‌গত অশ্রুতে যেন টলমল করছে।

ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে এবার ভদ্রমহিলা বললেন, আ—আমি তার মা।

কি? কি বললেন? চমকে ওঠে যেন ভূত দেখার মতই ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায়। বলে, না, না,—এ—এ আপনি কি বলছেন?

দুর্ভাগ্য আমার, কথাটা মিথ্যা নয়, নিষ্ঠুর সত্য, সত্যিই আমি তার মা। তাকে গর্ভে ধরেছিলাম একদিন—

কথাটা বলতে বলতে হতভাগিনী জননীর দু চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ভদ্রমহিলা আবার বলতে লাগলেন, যেদিন এক মধ্যরাত্রে পোড়া মুখ নিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকল, সেইদিনই প্রথম নিঃসংশয়ে জানতে পেরেছিলাম কোন সর্বনাশা

দুষ্কৃতির পাঁকের মধ্যে সত্যিই সে ডুবে গিয়েছে। এবং সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, বুঝি অবশ্যম্ভাবী তার পিতৃরক্তের ঋণ সন্তানকে শোধ করতেই হয়। নচেৎ কোন কিছুর অভাবই তো ছিল না তার। সুস্থ, ভদ্র জীবন-যাপন করবার মত তো সব কিছুই ছিল তার, তবু ঐ সর্বনাশা পথেই বা কেন সে ডুবে গেল।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা আবার থামলেন।

সুনন্দ বুঝতে পারে, কষ্ট হচ্ছে কথাগুলো বলতে ভদ্রমহিলার।

ভদ্রমহিলা যেন একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, এই ভাবে মাঝরাতে তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে এনে তোমাকে বিরক্তই করছি। কিন্তু—

না, না—আপনি কি বলছিলেন বলুন—

সুনন্দ বলে কথাটা, কারণ ইতিমধ্যে ঘুম ভাঙিয়ে তোলার যে বিরক্ত ভাবটা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটা আর তখন ছিল না। বরং একটা কৌতূহলই যেন তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল।

সমাজের বুকে ধনী ও অর্থবান মানুষদের বুকের মধ্যে গত কয় বছর ধরে যে মানুষটা একটা ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, এবং যে আইনের সর্বপ্রকার কড়াকড়ি সত্ত্বেও আইন ও পুলিসের কর্তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সকলের চোখের সামনেই বলতে গেলে এতকাল নির্ভয়ে বিচরণ করছিল—সেই মঙ্গল, দস্যু মঙ্গল, ওরফে যমুনাপ্রসাদ, ওরফে হীরক চৌধুরী, কুৎসিত ভয়ঙ্কর লোকটার মা কিনা ঐ অপূর্ব সুন্দরী মহিলা!

এও কি সম্ভব, এই মহিলারই সন্তান ঐ জঘন্য চরিত্রের মানুষটা! যাকে আজ কিছুদিন হলো জেলের মধ্যে বিচারাধীন সর্বদা সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে! যে লোকটার বিরুদ্ধে চার্জের অন্ত নেই!

জাল, রাহাজানী, লুঠ, স্মাগলিং—হেন কুকাজ নেই যা সেই লোকটা করে নি গত কয়বছর ধরে।

যাকে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এতদিনে।

সেই জঘন্য নরপশুটার মা ঐ তার সামনে সোফার পরে উপবিষ্টা!

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই গিয়েছিল ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায়।

তারপরই এক সময় হঠাৎ যেন সেই আশ্চর্য স্বপ্নটার কথাই ভদ্রমহিলার মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে সুনন্দর।

বিচিত্র এক স্বপ্ন। যে স্বপ্ন সেই শৈশব থেকে আজো পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে তাকে ঘুমের ঘোরে হানা দেয়।

বিচিত্র দুর্বার ভয়াবহ এক জলস্রোত। কালো কালির মত অন্ধকারে বিশ্বচরাচর লুপ্ত আর সেই অন্ধকারে পারাবারহীন অতল জল।

জল, জল আর জল।

তার মধ্যে একখানি মুখ। যে মুখখানি কেবলই মনে করিয়ে দিয়েছে তার অজ্ঞাত—অপরিচিত মৃতা জননীর কথা। মায়ের কথা।

মা! তার কল্পনার জননী, স্বপ্নের জননী। তার মা!

যাকে সে বার বার স্বপ্নের ঘোরেই শুধিয়েছে, তুমিই কি আমার মা? কিন্তু কোন জবাব মেলে নি।

স্বপ্নের সে মূর্তি যেন কুয়াশার মত স্বপ্নের রাজ্যেই এক সময় মিলিয়ে গিয়েছে।

ঘুম ভেঙে গিয়েছে। এবং মনে মনে ভেবেছে প্রতিবারই জাগ্রতাবস্থায়, এমন অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখে কেন? এ স্বপ্নের কি অর্থ?

কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায় নি।

প্রচণ্ড জলস্রোত। ভয়াবহ গর্জন। তারই মধ্যে থেকে এক নারী যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বপ্নের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য, তারপরই আবার মিলিয়ে গিয়েছেন, হারিয়ে গিয়েছেন।

সত্যিই কোন অর্থই তার খুঁজে পায় নি সুনন্দ।

বাবাকেও সে শুধিয়েছে, স্বপ্নটা কেন সে প্রায়ই দেখে।

বাবা বলেছেন, স্বপ্ন স্বপ্নই—

মন যেন মেনে নিতে চায় নি বাবার কথাটা। তাই আবার শুধিয়েছে, বাবা, আমার মা কেমন দেখতে ছিলেন?

কালীপ্রসন্ন যেন কেমন একটু বিব্রত বোধ করে ছেলের ঐ প্রশ্নে। বলেছেন, ফটো কখনো তোলা হয় নি কিনা তোমার মা-র। তিনি ফটো তোলা পছন্দ করতেন না।

মনটা কিন্তু সুনন্দর তবু শান্ত হয় নি।

প্রত্যেকের বাড়িতেই তাদের মায়ের ফটো আছে, কেবল তাদের বাড়িতেই তার মায়ের কোন ফটো নেই। কিন্তু কেন?

॥ দুই ॥

সামনের ঐ আগন্তুক মহিলার মুখখানা দেখার পর যেন সুনন্দর মনের মধ্যে বহুবারের স্বপ্নে দেখা সেই মুখখানা মনের পাতায় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

হঠাৎ আবার সুনন্দর মহিলার দিকে যেন নজর পড়লো, মহিলাটি চুপচাপ বসে আছেন পূর্ববৎ মাথা নীচু করে।

থামলেন কেন, বলুন কি বলছিলেন?

সুনন্দর মনে হলো ভদ্রমহিলা যেন কি ভাবছিলেন, হঠাৎ যেন সুনন্দর প্রশ্নে একটু চমকে উঠলেন। কিন্তু এবারও মুখ তুললেন না।

মুখখানি নীচু করেই পূর্ববৎ মৃদু শান্তকণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে হলেও জানি তো তার অপরাধের সীমা নেই। আর এও জানি সমাজে আইনভঙ্গকারী দুষ্কৃতি-কারীকে শাস্তি পেতেই হবে। তবু তো কই শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে ছুটে না এসে পারলাম না।

হঠাৎ আবার একটু চুপ করে থেকে মহিলা বললেন, আচ্ছা, ওর কি মুক্তির কোন আশাই নেই?

আপনার ও প্রশ্নের জবাব তো আমি দিতে পারব না। আইন দেবে, বিচারক দেবেন।

জানি বৈকি ও যা অপরাধ করেছে তার জন্য নিশ্চয়ই ওকে গুরু দণ্ড নিতে হবে।

কথাটা বলে মহিলা সুনন্দর মুখের দিকে তাকালেন।

তাই তো মনে হয়।

ফাঁসীও হতে পারে?

সে কথা একমাত্র বিচারকই বলতে পারেন। তবে—

জানি। ফাঁসীই হয়তো তার হবে।

যদিচ সুনন্দ তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে জানে মঙ্গলের ফাঁসী না হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবেই, তবু কেন যেন কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি ওঁকে মুখের ওপরে বলতে পারে না।

বলতে গিয়েও যেন ভিতর থেকে কে তার কণ্ঠ টিপে ধরে। বলে শুধু, কেউ কি সে কথা বলতে পারে এখনই! হয়তো বিচারে মুক্তিও হতে পারে।

মুক্তি! না—আমি কি বুঝতে পারছি না তুমি আমাকে মিথ্যা স্তোক দিচ্ছ! সে আমার একমাত্র সন্তান হলেও, আমি তার মা হলেও আমি কি জানি না কি ঘৃণ্য অপরাধে সে অপরাধী? মা হয়েও মনে মনে কতবার কি আমিই প্রার্থনা করিনি সে ধরা পড়ুক, তার সমস্ত অপরাধের দণ্ড নিয়ে সে তার সমস্ত পাপের, সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক। কিন্তু তার নিরপরাধিনী স্ত্রী, আমার সতীলক্ষ্মী বৌমা—সে তো কোন অপরাধ করে নি। তার নিষ্পাপ শিশুপুত্রটি—সে তো কোন অপরাধ করে নি, তবে তাদের কেন তাদের স্বামীর, বাপের পাপের, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? তোমাদের আইন কি একটিবারও সে কথাটা ভাববে না?

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন মহিলা, আজও সে ছেলেমানুষ, জানে না তার বাপের সত্য পরিচয়টা। কিন্তু বড় হয়ে যখন একদিন সব শুনবে সেদিন সে কোথায় দাঁড়াবে। আর, সেদিন সমাজের বিষদৃষ্টিতে যদি অভিমান করে তার বাপেরই পথ অনুসরণ করে—না, না—বলতে বলতে হঠাৎ যেন শিউরে উঠলেন মহিলা।

সুনন্দ ভদ্রমহিলার কথার কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। আর জবাব দেবেই বা কি, জবাব দেবার মতো আছেই বা কি!

সুনন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

ভদ্রমহিলাও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, অথচ কি চেষ্টাটাই না আমি করেছি ও যাতে এই পথে না আসে। চৌধুরী বংশের সন্তানকে ঐ পাপের অনিবার্য পরিক্রমণ থেকে বাঁচাতে কি চেষ্টাটাই না আমি করেছি। কিন্তু কি হলো, কিছুই হলো না।

সুনন্দ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে। ভদ্রমহিলা তখনো বলছেন, সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হলো। আমার স্বামী নেশার ঘোরে যে পথে সারাজীবন ধরে ছুটেছিলেন—হীরকও সেই পথেই গেল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভুল। মৃত্যু-মুহূর্তে অনুতাপের গ্লানিতে যখন তিনি আমার হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, মহাশ্বেতা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বুঝতে পারছি—ভুল, ভুল করেছি। অন্ধকার এই পথে শুধু আছে অভিশাপ আর কলঙ্ক, ব্যথা আর মর্মদাহ। হীরক—আমার হীরককে তুমি রক্ষা করো। চৌধুরীবংশের রক্তকে এই পাপ-পরিক্রমণ থেকে রক্ষা করো। হীরক যেন কোনদিন না জানতে পারে, তার বাপের স্মৃতিমাত্রও ঘৃণার এবং দুঃসহ লজ্জার। বলতে বলতে আবার থামলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন শুনতে থাকে মহাশ্বেতার কাহিনী সুনন্দ রায়।

মহাশ্বেতা আবার বলতে লাগলেন, কলকাতায় কলেজে পড়তো হীরক তখন, কলেজের সেরা ছেলে, লেখায়-পড়ায়, খেলায়-ধূলায় তার জুড়ি নেই—একটা পিঁপড়েকে পর্যন্ত সে হত্যা করতে পারত না। সেই ছেলে আমার—স্বামীর মৃত্যুর পর তিনটি বছরও গেল না—ভয়াবহ, ঘৃণ্য একটা শয়তানে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু আজও বাবলু জানে না তার বাপের সত্য পরিচয়।

এতক্ষণে কথা বলে সুনন্দ, বাপের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না?

না। আজও দেখা হয়নি।

বাড়িতে থাকে না সে?

থাকে, কিন্তু হীরককে তো বাড়িতে আর সে রাত্রের পর ঢুকতে দিই নি। সে-ও আর আসে নি।

কত বয়স তার?

পাঁচ বছর বয়স। কিন্তু একদিন সে তো বড় হবে, একদিন তো সব কিছুই জানবে এবং যে পাপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সেই পাপের অভিশাপই তাকে সমস্তটা জীবন ধরে তাড়া করে বেড়াবে। তাই, তাই আমি তোমার কাছে এসেছিলাম কোন পথই কি নেই ঐ নিষ্পাপ শিশুকে তার বাপের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবার, কোন উপায়ই কি তুমি করতে পার না?

আমি! আমি এ ক্ষেত্রে কি করতে পারি? সবিস্ময়ে তাকায় সুনন্দ মহাশ্বেতা দেবীর মুখের দিকে প্রশ্নটা করে।

তুমিই তো তাকে ধরেছ।

হ্যাঁ, ধরেছি বটে, কিন্তু বিচারক তো আমি নই। সরকারের আদালতে তার বিচার হবে। তাছাড়া সে অপরাধী। অপরাধীর যদি দণ্ড না হয় তাহলে ন্যায়, ধর্ম বলে আর রইলো কি?

সুনন্দর শেষ কথায় মহাশ্বেতা যেন আর কোন জবাব দিতে পারেন না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। অপরাধীর দণ্ড হবে বৈকি।

কথাটা বলতে বলতে কতকটা যেন আচ্ছন্নের মতই উঠে দাঁড়ালেন মহাশ্বেতা, আমি যাই—সত্যিই তো অপরাধীর দণ্ড হবে বৈকি। সে যে অপরাধী—

ধীরে ধীরে ঘরের খোলা দ্বারপথে বের হয়ে গেলেন মহাশ্বেতা।

সুনন্দ রায় নিঃশব্দে শুধু দেখলো মহাশ্বেতা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দটা ঘরের বাইরে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ তারপরও সোফাটার পরে ঝিম দিয়ে বসে থাকে সুনন্দ।

তার কেবলই যেন মনে হতে থাকে, ঐ ভদ্রমহিলা যে কথাগুলো তাকে বলে গেলেন, সে কথাগুলোই সব নয়। শুধু ঐটুকু বলবার জন্যই তিনি আসেন নি। আরো যেন তাঁর কি বলবার ছিল, যা তিনি বলতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

কিছু কি সত্যিই তিনি বলতে এসেছিলেন তাকে, আর কিই বা বলতে এসেছিলেন এবং কেনই বা বলতে এসেছিলেন? আরো একটা ব্যাপার সুনন্দ লক্ষ্য করেছে, অতক্ষণ ধরে মহাশ্বেতা তার সঙ্গে বসে কথা বললেন, কিন্তু একটিবারের জন্যও মুখ তুলে তাকালেন না।

কিন্তু কি বলতে এসেছিলেন তিনি সুনন্দর কাছে?

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে হতেই চমকে ওঠে সুনন্দ। তবে কি, তবে কি তিনি যমুনাপ্রসাদ—হীরক চৌধুরী—তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হোক, ঐ ধরণেরই একটা কিছু অনুরোধ প্রকারান্তরে জানাতে এসেছিলেন তার কাছে?

না, না—পাগল! তা কেন হতে যাবে, মায়ের প্রাণ কিনা, তাই হয়তো কি অনুরোধ করতে এসেছিলেন চিন্তাও করতে পারেন নি।

তাছাড়া, সে আজ সরকারের জেলখানায়, তাকে ছেড়ে দেবার তারই বা সাধ্য কোথায়? এই সহজ কথাটা বুঝতে পারবেন না তিনি তাই বা কি করে সম্ভব?

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, না, না—তা নয়। তাছাড়া ছেলে যে তাঁর অপরাধী, সে তো নিজের মুখেই স্বীকার করে গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! ঐ মুহূর্তে বিচিত্র এক চিন্তা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে, তার মনে হয়, যদি আজ তার যমুনাপ্রসাদকে ছেড়ে দেবার কোন ক্ষমতা থাকতো, সে হয়তো ছেড়ে দিতেও পারত।

চুপিচুপি এই রাত্রে জেলে গিয়ে গারদ-ঘরের তালাটা খুলে দিয়ে বলতো, পালাও—শিগগির পালাও।

যমুনাপ্রসাদ তার কথায় অবাক হয়ে যেত বৈকি। যে সুনন্দ রায় তাকে কয়েক বছর ধরে ধরবার, জীবিত বা মৃত, আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, সেই সুনন্দ রায়ই তাকে ধরবার পর আজ আবার ছেড়ে দিচ্ছে—আশ্চর্য সে হতো বৈকি।

এবং কথাটা জানাজানি হলে সরকার তাকে তার ঐ অপরাধের জন্য হয়তো গুরুতর শাস্তিও দিত। তবু তার হয়তো দুঃখ থাকতো না।

স্বপ্নে দেখা তার মা যে ক্ষণপূর্বের আগন্তুক ঐ ভদ্রমহিলার চেহারার মধ্যে তার সামনে সত্য হয়ে এসে জাগরণের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, যে স্বপ্ন মুহূর্তের জন্য হলেও সত্য হয়ে উঠেছিল, সে মনে করতো যা কিছু করেছে, তার সেই মা-র জন্যই যে করেছে—যে মা ওর মধ্যে সত্য হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কোন দুঃখ, কোন লজ্জাই তার থাকতো না।

সে তো আর কারো জন্য কিছু করে নি।

সে যা করেছে সব তার মা-র জন্যই করেছে।

মা। তার মা! যে মাকে সে জীবনে কোনদিনও দেখল না!

যে মাকে সে শুধু স্বপ্নের মধ্যেই হাতড়ে ফিরেছে, সেই মা-র কথাই বা কেন মনে হল ওঁকে দেখে। আশ্চর্য! আর কখনো কাউকে দেখে তো কথাটা তার মনে হয় নি। আজই বা মনে হলো কেন ওঁকে দেখে?

হঠাৎ যেন সুনন্দ রায়ের চিন্তাসূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেল।

দোতলায় তার শোবার ঘরে টেলিফোনটা একটানা বেজে চলেছে।

উঠে দাঁড়ায় তাড়াতাড়ি সুনন্দ। এই ভোররাত্রে কে আবার ফোন করছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সোজা শোবার ঘরে এসে ঢুকল সুনন্দ। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

হ্যালো?

ডি. এস. পি. মিঃ মুখার্জি কথা বলছি।

বলুন স্যার!

এইমাত্র সেন্ট্রাল জেল থেকে মিঃ ভট্টাচার্য ফোন করে জানালেন, মঙ্গল—

কি? কি হয়েছে?

জেল থেকে সে কেমন করে পালিয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ। সন্ধ্যা থেকেই পেটের ব্যথায় সে নাকি ছটপট করছিল—তারপর মেট তাঁকে খবর দেওয়ায় তিনি ডাক্তারকে জানান। ডাক্তারবাবু গিয়ে পরীক্ষা করে বলেন, অ্যাকিউট অ্যাপেনডিসাইটিস। এবং তক্ষুনি তাকে অ্যাম্বুলেন্সে সতর্ক প্রহরায় হাসপাতালে রিমুভ করা হয়; কিন্তু হাসপাতালে এসে সে পৌঁছাবার পর দেখা গেল, সে মঙ্গল নয়, অন্য কয়েদী।

তার মানে?

জানি না। ওই তো শুনছি।

ভাল করে জেল খুঁজে দেখা হয়েছে?

হয়েছে। সেখানে সে নেই।

হাসপাতালে যাকে রিমুভ করা হয়েছে সে কে?

১১১ নং কয়েদী—ব্রিজনন্দন।

ব্রিজনন্দনই তাহলে এখন হাসপাতালে?

হ্যাঁ—তাকে অপারেশন টেবিলে রিমুভ করা হয়েছে। ব্যাপারটা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি বায়। তুমি একবার এক্ষুনি জেলে এসো, আমিও যাচ্ছি!

আমি এখুনি যাচ্ছি স্যার।

সুনন্দ ফোনটা নামিয়ে রেখে দিল ধীরে ধীরে।

॥ তিন ॥

মঙ্গল, যমুনাপ্রসাদ—অর্থাৎ হীরক চৌধুরী জেল থেকে সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও পলাতক।

ব্যাপারটা যা ডি. এস. পি.-র মুখে ফোনে শোনা গেল, শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, রীতিমত দুর্বোধ্য।

হঠাৎ মনে পড়ে সুনন্দর একটু আগে মহাশ্বেতা দেবীর কথা।

মনে মনে কি একটু আগে তাই কামনা করছিল না সুনন্দ? মনে মনে কি সে ভাবছিল না, ক্ষমতা তার হাতে থাকলে মহাশ্বেতার ছেলেকে সে ভয়ঙ্কর অপরাধী জানা সত্ত্বেও ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হতো না।

সুনন্দ এগিয়ে এসে একটা আরাম-কেদারায় গা ঢেলে দিল।

হীরক চৌধুরী পালিয়েছে জেল থেকে। যাক সে পালিয়ে। ভগবান মহাশ্বেতার করুণ আবেদন শুনেছেন।

কিন্তু পালালেই কি সে সরকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে? ধরা আবার তাকে পড়তেই হবে। সুনন্দ না ধরুক—অন্য কেউ তাকে ধরবেই। তারপর ধরা পড়লে তার সুনিশ্চিত কঠোর দণ্ড হবে।

কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী—ঐ হীরক চৌধুরীর মা, তার নিরপরাধিনী স্ত্রী, তার নিরপরাধ শিশুসন্তান—তারা তো কোন দোষে দোষী নয়। তবু তাদের প্রত্যেককে পুত্রের, স্বামীর এবং পিতার দুরপনেয় কলঙ্ক মাথা পেতে নিতে হবে।

মহাশ্বেতা দেবী বলছিলেন, বাপের রক্তের ঋণ তার ছেলেকে শোধ করতে

হচ্ছে। কে ছিল ঐ দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল হীরক চৌধুরীর বাপ? কি তাদের পরিচয়?

ঢং ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বাজল।

কখন জেল থেকে পালিয়েছে হীরক কে জানে? কিন্তু আর তো সময়ক্ষেপ করা চলে না। মিঃ মুখার্জি তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

উঠে দাঁড়াল সুনন্দ। পাশের ঘরে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে নিল। ঘর থেকে বেরুতে যাবে, বুড়ি ঝি সারদা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। সারদার হাতে প্রভাতী চা।

এ কি—বেরুচ্ছ নাকি? সারদা চায়ের কাপটা সুনন্দর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। হ্যাঁরে, বাহাদুর উঠেছে?

না।

তাহলে তুই চল, নীচে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিবি।

আমি নীচেই আছি, ডেকো, দরজা বন্ধ করে দেবো'খন। সারদা চলে গেল ঘর থেকে।

সুনন্দ রাস্তায় এসে নামল। এবং শ্লথ মন্থর গতিতে হাঁটতে শুরু করল।

যাবার যেন ইচ্ছাই করছে না আদৌ। তবু যেতে হবে বলেই যাওয়া। সত্যিই বিচিত্র অনুভূতি যেন একটা।

যে দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল যমুনাপ্রসাদকে ধরবার জন্য গত কয় বছর তার নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত সময়মত ছিল না।

একবার কলকাতা, একবার ইউ. পি., একবার বিহার দৌড়াদৌড়ি করে বেড়িয়েছে, যাকে অতি কষ্টে ধরে গারদ-ঘরে পুরেছিল, সেই লোকটা গারদ-ঘর থেকে পালিয়েছে, অথচ তার মধ্যে কোন হতাশা বা চাঞ্চল্যই সে বোধ করছে না!

এমন কেন হয়? আর কি করেই বা হয়?

কে মহাশ্বেতা দেবী তার? কোন পরিচয়ই তো তাঁর সঙ্গে তার নেই। কোন সম্পর্ক নেই।

একটিবার মাত্র জীবনে যাঁকে দেখেছে—তাও যে পরিচয়—সেটাও হচ্ছে একজন দুর্দান্ত ক্রিমিন্যালের মা রূপে। কোন সহানুভূতিই সেখানে জাগতে পারে না।

কিন্তু তবু তিনি যখন মাথাটি নীচু করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, কি একটা ব্যথায় বুকের ভিতরটা তার টনটন করে উঠেছিল।

মনে হয়েছিল ক্ষমতা থাকলে আর তাঁকে সে হাহাকার নিয়ে ফিরে যেতে দিত না।

মা বলে ডেকে তাঁর বুঝি পায়ের ধুলো নিতে পারলে যে তৃপ্তিতে বুক তার ভরে যেতো, সে তৃপ্তির বুঝি তুলনা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে সুনন্দ ট্রাম-রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একটা ট্রাম আসছে চং চং ঘণ্টি বাজিয়ে। তাড়াতাড়ির কি এমন আছে। যাক না ট্রামটা চলে।

সত্যি সত্যিই ট্রামটা ছেড়ে দিল সুনন্দ। এবং তার পরেরটাও। তৃতীয় ট্রামটায় উঠে বসলো।

জেলখানাতে সুনন্দ যখন এসে পৌঁছিল, তখন সেখানে রীতিমত একটা উত্তেজনা চলেছে সর্বত্র।

কয়েদীদের প্যারেড নেওয়া হচ্ছে। স্বয়ং কমিশনার থেকে শুরু করে পুলিসের সমস্ত বড় বড় কর্মচারীরাই উপস্থিত।

মঙ্গল যে জেল থেকে সতর্ক প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কখন কোন পথে পালাল তারই আলোচনা সবাই করছেন।

রীতিমত যাকে বলে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

সুনন্দকে দেখে জেলের সাহেব ভট্টাচার্য এগিয়ে এলেন শুকনো মুখে। সমস্ত দায়িত্ব তো তাঁর পরেই ছিল। অনুযোগ শুনতে হবে তাঁকেই বেশি।

শুনেছেন বোধহয় সব সুনন্দবাবু?

শুনেছি।

কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই। এ যেন সত্যি সত্যি একটা ভৌতিক ব্যাপার।

ডি. এস. পি. মিঃ মুখার্জি এগিয়ে এলেন, সর্বত্র ওয়ারলেস্ সিগন্যাল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমিও একবার ভ্যান বা জীপ নিয়ে বের হয়ে পড়ো সুনন্দ।

কিন্তু আমি—

হ্যাঁ, তুমি। তোমাকেই এ কাজের ভারটা নিতে হবে সুনন্দ।

ক'দিন থেকে আমার শরীরটা বড় খারাপ। ভাবছিলাম, মাসখানেকের ছুটি নেবো—

কিন্তু এ সময়—

চক্রবর্তীকে বলুন।

চক্রবর্তী অবশ্যি আগেই বের হয়ে গিয়েছে একটা জীপ নিয়ে। কিন্তু এ সময় তুমি ছুটি চাইছ—

আপনি ভাবছেন কেন স্যার, যাবে কোথায় সে! ধরা তাকে পড়তেই হবে, সুনন্দ যেন মিঃ মুখার্জিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ, ধরবো তো তাকে নিশ্চয়ই আমরা।

হ্যাঁ, কতদূর আর এর মধ্যে যেতে পারে, আশে-পাশেই হয়তো কোথায় পাওয়া যাবে।

তোমার তাই ধারণা রায়?

তাছাড়া কি?

আচ্ছা রায়, ওর কোন ডিটেলস্ জোগাড় করতে পেরেছিলে? ওর আসল বাড়ি কোথায়? মা বাপ, কি জাত—পূর্ব কোন ইতিহাস?

না। পুলিস-রেকর্ডে আমাদের যেটুকু আছে, তার বেশি কিছুই আমি জানতে পারি নি।

পুলিস-রেকর্ডে তো আছে লক্ষ্ণৌর কাছে প্রতাপগড়ে ওর বাড়ি। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক নয় কথাটা।

কেন?

সেখানেও ধরা পড়বার পর অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম, কিন্তু মঙ্গল বলে কোন লোকের কথা কেউ বলতে পারল না। তবে একটা কাজ করা হয় নি—

কি? একটু যেন চমকেই ডি.এস. পি.-র মুখের দিকে তাকায় সুনন্দ।

এই কলকাতা শহরে অ্যাভিন্যুতে একটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে রত্না নামে একটা মেয়ে থাকে। ঐ রত্নার কাছে মধ্যে মধ্যে আসতো মঙ্গল শোনা গেছে—

রত্নাকে ক্রস্ করা হয় নি?

না। যেদিন মঙ্গল ব্যারাকপুরে ধরা পড়ে, তার ক'দিন আগে থেকেই রত্না নাকি কলকাতার বাইরে চন্দননগরে ছিল। সে যাক্—তোমার কি সত্যিই এখন ছুটির প্রয়োজন আছে সুনন্দ?

সত্যিই শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না স্যার।

বেশ। তবে আর কি বলবো, তুমি না-হয় দিন কতক বিশ্রামই নাও।

এত সহজে যে সুনন্দ নিষ্কৃতি পাবে, সত্যিই ভাবতে পারে নি।

ছুটিটা পেয়ে যেন সুনন্দ একটা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। কেন এবং কিসের যে স্বস্তি, সেটা কিন্তু বুঝতে পারে না ঠিক। হীরক চৌধুরীকে খোঁজ করে বেড়াতে হল না, তাই কি?

কিন্তু হীরকের মত একটা ক্রিমিন্যাল আইনের হাত থেকে যে পালিয়ে বেড়াবে তাই বা কোন্ যুক্তি।

কিন্তু, আবার মনে হয় সুনন্দর, হীরক ধরা পড়ল কি না তাতেই বা কি এসে গেল তার। হীরক তার কে?

একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল, কত হত্যার রক্তে রঞ্জিত হয়তো হাত দুটো তার। কতজনের চরম সর্বনাশ করেছে। সমাজের একটা অভিশাপ, ব্যাধি।

আর সে? আইনের একজন প্রতিভূ।

সরকার বিশ্বাস করে তার হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। অপরাধীকে ধরবার জন্যই তার চাকরি। আর সে কিনা ভাবছে হীরক যাতে না ধরা পড়ে।

চমকে ওঠে যেন কথাটা ভাবতে গিয়েও সুনন্দ।

সত্যিই কি তাই সে ভাবছে!

সত্যিই কি সে চায় মহাশ্বেতার সন্তান হীরক চৌধুরী যাতে ধরা না পড়ে!

না, না—তা কেন?

পড়ুক ধরা সে। আইনের বিচারে তার যা দণ্ড হওয়া উচিত হোক।

কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা?

তাঁর নীরব সেই কাকুতি?

তাঁর দুটি চোখের সেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিবিড় স্নেহ?

আবার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে সুনন্দ নিজের ঘরে আরাম-কেদারাটার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে ছিল।

সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যায়।

তার বাবার পায়ের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

বাবা হঠাৎ কোন চিঠি-পত্র না দিয়ে কাশী থেকে চলে এলেন!

সুনন্দর অনুমান ভুল নয়। কালীপ্রসন্নই এসে ঘরে ঢুকলেন।

বাবা! এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নেয় সুনন্দ।

হঠাৎ কাশী থেকে চলে এলেন, কোন কাজ ছিল কি?

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন কালীপ্রসন্ন, হ্যা, একটু বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হলো।

সারদাকে হাত-মুখ ধোয়ার জল দিতে বলি?

হবে'খন? ব্যস্ত হয়ো না। বোস তুমি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই বাপের মুখের দিকে তাকাল সুনন্দ।

চিরদিন রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির লোক কালীপ্রসন্ন রায়। এবং অত্যন্ত মিতবাক। গত পাঁচ বছর কাশীবাসী।

সুনন্দ বি. এসসি. পাস করে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাশীতে গিয়ে বসবাস করছেন।

সুনন্দর অবিশ্যি ইচ্ছা ছিল না। সে বলেছিল, কেন যাবেন বাবা কাশীতে—এখানে কি আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে ?

না। কষ্ট নয় কিছু। তোমাকে মানুষ করাই ছিল আমার প্রধান কর্তব্য ; মানুষ হয়েছ তুমি, এবারে আমার ছুটি ; আর সংসারে থাকতে ইচ্ছে নেই। বলেছিলেন কালীপ্রসন্ন জবাবে।

দ্বিতীয় আর কোন কথা বলতে বাপকে সাহস হয় নি সুনন্দর।

চেয়ারটার পরে বেশ কিছুক্ষণ যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কালীপ্রসন্ন।

মনের মধ্যে তখনো যেন একটা দ্বিধা। কথাটা বলবেন ছেলের কাছে, না, বলবেন না ? কিন্তু কথাটা তো আজ আর না বললেও নয়। আজ যে সব কথা সুনন্দকে তাঁর বলা একান্তই প্রয়োজন। আর সেইজন্যই কি তিনি ছুটে আসেন নি এখানে ?

ইদানীং কিছুদিন ধরেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল, তাই কথাটা যে আজ সুনন্দকে বলা প্রয়োজন সেটা যেন বেশি করেই তাঁর মনে হচ্ছিল।

না। বলতেই হবে।

মনের সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে অদূরে মুখোমুখি উপবিষ্ট সুনন্দর মুখের দিকে তাকালেন।

সুনন্দ !

বাবা !

আজ তোমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবো আমি, যে প্রশ্ন বহুবার তুমি আমাকে করেছ কিন্তু জবাব দিই নি—মানে, ইচ্ছে করেই জবাব দিই নি।

বাপের মুখের দিকে নিঃশব্দে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুনন্দ।

অবিশ্যি কথাটা তোমাকে আগে বলার আমার কোন প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু আজ সময় এসেছে কথাটা বলবার, এবং কথাটা তোমার জানা প্রয়োজন। তারপর একটু থেমে বললেন, সংবাদপত্র আমি বড় একটা পড়ি না। কিন্তু হঠাৎ সেদিন,

মানে, পরশুদিন পুরোনো এক সংবাদপত্রে একটা নিউজ দেখলাম—দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল মঙ্গল ধরা পড়েছে, আর তুমিই তাকে ধরেছ।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ঠিক কি যে বলতে চাইছেন, আমি তো বুঝতে পারছি না বাবা।

ঐ মঙ্গলকে আমি চিনি—ওর আসল নাম মঙ্গল নয়, যমুনাপ্রসাদও নয়, ওর আসল নাম হীরক চৌধুরী।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে যেন সুনন্দ বাপের মুখের দিকে।

পূর্ববঙ্গের এক ধনী জমিদার-বংশের সন্তান ও। শুধু জমিদারই নয়—কলকাতায় তার বিরাট কাঠের কারবারও ছিল। ওর বাপের নাম মৃগাঙ্কমোহন চৌধুরী।

আপনি—আপনি এসব কি করে জানলেন?

আমি মৃগাঙ্কমোহনকে চিনতাম। চিনতাম বললে ভুল হবে—সে ছিল আমার এক সময় অভিন্নহৃদয় বন্ধু—এবং আমার কারবারের অংশীদার।

মৃগাঙ্কমোহনের স্ত্রীর নামই কি তাহলে মহাশ্বেতা দেবী?

কালীপ্রসন্ন যেন কথাটা শুনে হঠাৎ চমকে উঠলেন। বললেন, তুমি—তুমি ও-নাম জানলে কি করে?

তিনি গত রাত্রে এখানে এসেছিলেন।

কি? কি বললে? মহাশ্বেতা এখানে এসেছিলেন? তোমার কাছে?

হ্যাঁ। তাঁর মুখ থেকেই প্রথম গত রাত্রে আমি শুনি মঙ্গলের আসল নাম হীরক চৌধুরী—এবং সে তাঁর ছেলে—

আর? আর কিছু তিনি তোমাকে বলেছেন?

হ্যাঁ—

কি? কি বলেছেন আর?

তাঁর স্বামীর পাপের রক্তের ঋণই নাকি শোধ করছে ঐ মঙ্গল—

বলেছেন, বলেছেন মহাশ্বেতা সে কথা?

হ্যাঁ।

॥ চার ॥

কালীপ্রসন্ন অতঃপর কিছুক্ষণ যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে কতকটা আত্মগতভাবেই বললেন, হ্যাঁ, মিথ্যা নয়, পাপের ঋণই বটে। বাপের পাপের ঋণ শোধ করেছে আজ তার ঐ হতভাগ্য ছেলে

হীরক। অভিশাপ—কিন্তু তারপরই জনান্তিকে বললেন, কিন্তু কেন এসেছিলেন মহাশ্বেতা তোমার কাছে?

মনে হয়, কিছু যেন বলতে এসেছিলেন।

বলতে? কি বলতে?

সম্ভবতঃ তাঁর ছেলে হীরক সম্পর্কে। মুখ ফুটে যদিও কিছু বলেন নি—তবু মার প্রাণ তো! তাই ছেলের জন্য মনে হল কিছু যেন বলতে এসেছিলেন।

নিয়তির নির্মম পরিহাস। নচেৎ এমনটাই বা হবে কেন। কথাটা বলতে বলতে কালীপ্রসন্ন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

বাবা?

এঁ্যা? কিছু বলছিলে?

ওঁরা কি কলকাতাতেই থাকেন?

না। শ্রীরামপুরে। মৃগাঙ্কমোহন শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে মস্ত বড় বাড়ি কিনেছিলেন। 'মণিমঞ্জিল'। সব কথাই তোমাকে আজ বলবো বলেই এসেছি আমি সুনন্দ। সব কথাই তোমার আজ জানা প্রয়োজন। মৃগাঙ্কমোহন, মহাশ্বেতা হীরক এবং তোমার সমস্ত কথা।

আমার কথা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা, তাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

সেই কথাই আজ বলবো, অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর—একই রক্ত প্রবাহিত তোমার ও হীরকের শরীরে।

না, না—এ আপনি কি বলছেন? সুনন্দর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।

বোস, উত্তেজিত হয়ো না।

কিন্তু বাবা—

আমি তোমার বাবা নই সুনন্দ।

কি বললেন? একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার করে ওঠে যেন সুনন্দ, কি বললেন? আপনি আমার বাবা নন?

না।

তবে কে? কে আমি? কি আমার পরিচয়? আকুল উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে সুনন্দ।

হীরক আর তুমি সহোদর ভাই।

হীরক—হীরক আমার ভাই ?

হ্যাঁ। একই রক্ত তোমাদের উভয়ের দেহে প্রবাহিত। মৃগাঙ্কমোহনই তোমার বাপ, আর মহাশ্বেতা তোমার মা।

না, না—এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা নিছক সত্য—এবং আর দু'দিন পরে আদালতে যখন হীরকের বিচার শুরু হবে, সব কথাই প্রকাশ হয়ে পড়বে বুঝেই এতকাল যে কথা তোমাকে কোনদিন প্রকাশ করি নি, সেই কথাটাই বলবার প্রয়োজনবোধে এখানে আমি ছুটে এসেছি—নয়তো ভেবেছিলাম আমার মৃত্যুর পরই তুমি জেনো।

হীরকের ভাই আমি ? হীরক আমার ভাই—

এসব কি শুনছে সুনন্দ ! সে জেগে না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে !

দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল হীরক—তার আপন সহোদর ভাই ! তার এবং হীরকের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত !

না, না—সমস্ত কেমন যেন সুনন্দর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তার এতদিনকার জানাশোনা জগৎটা সব মিথ্যা ! কালীপ্রসন্ন তার কেউ নয় ! সে কালীপ্রসন্নর ছেলে নয় !

একটা দুর্নিবার লজ্জা, অপমান আর হাহাকার যেন তাকে গ্রাস করেছে।

আর্ত করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে সুনন্দ, না,না—বাবা—এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্থির শান্ত কণ্ঠে বললেন কালীপ্রসন্ন, বিশ্বাস না করতে পারলেও তাই সত্য সুনন্দ।

সত্য !

হ্যাঁ—

হীরক—হীরকের ভাই আমি !

হ্যাঁ—

তারপর কিছুক্ষণ আবার স্তব্ধতা।

এবং সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কালীপ্রসন্ন ডাকেন, সুনন্দ—

কেমন যেন সর্বহারার দৃষ্টিতে তাকাল সুনন্দ কালীপ্রসন্নর মুখের দিকে।

জানি সুনন্দ, তুমি অত্যন্ত shocked হয়েছো, কিন্তু—

না, বাবা shocked নয়, আমি—আমি ঠিক কি করবো বুঝতে পারছি না—

সুনন্দ !

শুনুন।

অবাক লাগছে, মহাশ্বেতাও কি তোমাকে চিনতে পারলেন না !

কিন্তু একথা কেন আপনি আমাকে বললেন ? আমি তো জানতে চাই নি—না জানলেও তো কোনদিন কিছু এসে যেতে না আমার—সুনন্দ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

যেতো সুনন্দ, যেতো। তাছাড়া আমার নিজেরও যে পাপ ছিল—

আপনার পাপ ?

হ্যাঁ, আমার—আমারও পাপ ছিল। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে সেদিন আমি—আমিও তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলাম—হ্যাঁ, একসঙ্গে পদ্মার বক্ষ সব নির্মূল করে দিতে চেয়েছিলাম—

আমাকে—আমাকে সব খুলে বলুন।

বলবো। কিন্তু সেকথা—সন্তানের মত তোমাকে পালন করেছি, পুত্রাধিক তুমি—তোমার সামনে বসে বলতে তো পারবো না। সব কথা আমি লিখে রেখেছি এই খাতাটায়—

বলতে বলতে একটা মোটা বাঁধানো নীল রংয়ের খাতা বের করলেন কাগজের মোড়ক খুলে কালীপ্রসন্ন এবং খাতাটা সুনন্দর সামনে ধরে বললেন, এই খাতাতেই সব—সব লেখা আছে। কিছু আমি গোপন করি নি। অকপটে সব স্বীকার করেছি। হ্যাঁ—এই খাতাটা পড়লেই সব তুমি জানতে পারবে সুনন্দ, তারপর তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করতে হয় করো, ঘৃণা করতে হয় করো।

খাতাটা রাখলেন কালীপ্রসন্ন সামনের গোল টেবিলটার 'পরে।

হ্যাঁ, কারণ তোমার কাছেও যে আমি অপরাধী। সে অপরাধের ক্ষমাও আমাকে চেয়ে নিতেই হবে। জানি না, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কি না। তবে জেনো ক্ষমা না করতে পারলেও কোন অভিযোগই আমার থাকবে না—কথাটা বলতে বলতে কালীপ্রসন্ন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমি—আমি তাহলে চলি সুনন্দ—আর এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি না জানি না সুনন্দ, কিন্তু মহাশ্বেতা, তোমার মা-র সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বোলো, অন্যায় আমি করেছিলাম সত্য কিন্তু সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তও আমি করেছি, তোমাকে মানুষ করে আজ আবার আমি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। বোলো তাঁকে—চৌধুরী বংশের অভিশাপ থেকে তুমি আবার একদিন তাঁদের মুক্ত করবে। তোমার পুণ্যতেই তাঁদের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক হতে মুক্তি-স্নান হবে।

সুনন্দ যেন পাথরের মতই বসে রইলো।

কালীপ্রসন্ন ধীর পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বসেই রইলো সুনন্দ যেমন বসেছিল সোফাটার 'পরে।

স্তব্ধ, অনড়, অচল।

আশ্চর্য! মহাশ্বেতা তার মা! তার গর্ভধারিনী জননী! ক্রিমিন্যাল হীরক চৌধুরী, জেল-পলাতক হীরক চৌধুরী—মঙ্গল—যমুনাপ্রসাদ তার ভাই! আপন সহোদর ভাই!

একই রক্ত তাদের উভয়ের শরীরের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত! একই বাপের ঔরসে, একই মায়ের গর্ভে জন্ম তাদের! একটু আগে কালীপ্রসন্ন মুখে স্বপ্নের ঘোরে কোন স্বপ্নকাহিনী সে শুনছিল না তো!

না, না—ঐ তো সামনেই টেবিলের উপরে পড়ে আছে সেই নীল খাতাটা। কালীপ্রসন্ন তো বলে গেলেন, তার জন্ম-বৃত্তান্ত সব, তার সব পরিচয়, ইতিহাস লেখা আছে ঐ খাতায়।

হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে যেন সম্মোহিতের মতই টেবিলের 'পর থেকে খাতাটা তুলে নিল সুনন্দ।

তার জন্ম-বৃত্তান্ত, তার পরিচয়। যে জন্ম-বৃত্তান্ত, যে পরিচয় এতকাল তার অজ্ঞাত ছিল, সেই অজ্ঞাত জন্ম-বৃত্তান্ত ও পরিচয় ছাব্বিশ বছরের এক অন্ধকার স্রোত পার হয়ে যেন আলোর বর্তিকা হাতে তার সামনে এসে আজ দাঁড়াল।

ছাব্বিশ বছর ধরে যে জন্ম-বৃত্তান্ত ও পরিচয় তার অজ্ঞাতই ছিল, না-হয় তা বাকী জীবন অজ্ঞাতেই থাকতো। কিছুই তো এসে যেতো না।

কালীপ্রসন্নর মিথ্যা পুত্র পরিচয়েই যদি গত ছাব্বিশ বছরের মত বাকী জীবনটাও বেঁচে থাকতো, এই পৃথিবীর কার কতটুকু কি তাতে করে এসে যেতো?

না, না—সে জানতে চায় না জন্ম-বৃত্তান্ত, তার পরিচয়।

পাগলের মতই যেন ছোঁ মেরে সামনের টেবিলের 'পর থেকে বাঁধানো মোটা নীল খাতাটা তুলে নেয়, তারপর ছুটে যায় পাশের ঘরে।

দিয়াশলাই জ্বালায়। পুড়িয়ে ফেলবে সে ঐ খাতা। কোন প্রয়োজন নেই তার। সে হীরকের ভাই নয়।

মহাশ্বেতা, মৃগাঙ্কমোহনের সন্তান নয়। স্বীকার করে না সে। স্বীকার করে না। সে কালীপ্রসন্নের সন্তান।

খাতার একটা পাতা ধরে জলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠিটার শিখায়।

আগুন ধরে ওঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই দুটি চোখ মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

মা! তার মা—

পোড়ান আর হলো না খাতাটা সুনন্দব।

নিভিয়ে দিল আগুনটা।

একটা বিশ্রী কাগজ পোড়া গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে।

নীল খাতাটা খুলে পড়া শুরু করে সুনন্দ।

শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিই সুনন্দ তোমার কাছে। কারণ, পুত্রস্নেহে এই দুটি হাত তোমায় পালন করলেও একদিন আমার এই দুটি হাতই তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হ্যাঁ। অস্বীকার করবো না।

হত্যাই তোমাদের সকলকে আমি করতে চেয়েছিলাম। চৌধুরীবংশকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলাম এ পৃথিবী থেকে।

যে আমার সুখের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার ঘরও আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বিধাতার বুঝি ছিল অন্য ইচ্ছা, তাই সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

সব কথাই আজ তোমাকে জানাব অকপটে।

মৃগাঙ্কমোহন আর আমি ছিলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

একসঙ্গে দুজনে কাঠের ব্যবসায় নেমেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিচয়েও তখনো জানতে পারি নি, মৃগাঙ্কমোহন মানুষের বেশে কতবড় একটা শয়তান। কি জঘন্য চরিত্র তার।

অকৃপণ হাতে বিধাতা তাকে রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে রূপের তলায় ছিল জঘন্য একটা পিশাচ।

কিন্তু সেদিন যদি ঘুণাক্ষরেও চিনতে পারতাম ভিতরের সেই মানুষটাকে।

যাক্, যেকথা বলতে বসেছি বলি।

বি. এ. পাস করে চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন কলকাতা শহরে। এমন সময় দৈবাৎ রাস্তায় বাল্যবন্ধু মৃগাঙ্কমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল এক দ্বিপ্রহরে।

কালী না?

হ্যাঁ—আরে মৃগাঙ্ক—

তারপর তোর খবর কি বল?

খবর আর কি, বেকার জীবন যাপন করছি। ম্লান হাসি হেসে বলে কালী-প্রসন্ন।

কিছু একটা জুটিয়ে নিতে পারলি না ?

না।

কিন্তু এই এঁদো পাড়ায় ঘুরছিলি কেন রে ?

এখানেই যে থাকি। কালীপ্রসন্ন বলে।

এখানে থাকিস মানে ? এই বস্তিতে ?

হ্যাঁ। কি করবো, তোর মত চক-মিলানো চার-মহল বাড়িতে থাকবো এমন ভাগ্য তো করে আসি নি—

নে, নে—হয়েছে। চল, ঘুরে যাই তোর বাড়ি।

দুজনে এগুতে থাকে একটা সরু গলির মধ্য দিয়ে। দিনের বেলাতেও সেখানে আলোর অভাব। ছম্‌ছমে অন্ধকার।

হ্যাঁরে কালী, বিয়ে করেছিস ? চলতে চলতেই একসময় প্রশ্ন করে মৃগাঙ্কমোহন।

হ্যাঁ—ঐ একটা ব্লাণ্ডার করে বসে আছি পিতৃআজ্ঞা পালন করতে গিয়ে সত্যযুগের সুবোধ রামচন্দ্রের মত। বাবা শুনলেন না কিছুতেই কথাটা। জোর করে ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে গেলেন হিমানীকে—

হিমানী বুঝি তোর স্ত্রীর নাম ? বেশ নামটা তো !

বেশই বটে। প্রায় দুজনেই জমে এলাম। হ্যাঁ, বাবা তো একবছর না যেতেই চোখ বুজলেন, এখন আমাদের চোখে ঘুম নেই। এই যে এসে পড়েছি—বলতে বলতে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়াটা নাড়াতে নাড়াতে ডাকে কালীপ্রসন্ন, হিমানী দরজাটা খোল। দেখ, কে এসেছে—

হিমানী এসে দরজাটা খুলে দিতেই তার দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্ক যেন ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি রে, দাঁড়ালি কেন, চল। তাগিদ দেয় কালীপ্রসন্ন।

হ্যাঁ হ্যাঁ—চল।

কি কুক্ষণেই যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম মৃগাঙ্কমোহনকে আমার বাসায়। ভাগ্যরন্ধ্রে যেন নিজে সাক্ষাৎ শনিকে আমি প্রবেশ করালাম।

কিন্তু আজ সেইসঙ্গে আবার মনে হয় মৃগাঙ্কমোহনেরই বা দোষ দিই কেন আর হিমানী—আমার স্ত্রীরই বা দোষ দিই কেন ?

আমারই নির্মম নিয়তি হয়ত সেদিন আমাকে আহ্বান করিয়েছিল মৃগাঙ্কমোহনকে আমার গৃহে। নিয়তিকে তো আজ পর্যন্ত কেউ এড়াতে পারে নি।

ইন্দ্রাণীর মত রূপ নিয়ে হিমানী আমার কুঁড়েঘরে বাস করার জন্য জন্মায় নি। তার ভাগ্যই আমার ভাঙা ঘরে মৃগাঙ্ককে টেনে এনেছিল।

সে রূপের ছিল দুর্বার আকর্ষণ।

মৃগাঙ্কমোহন সে আকর্ষণকে এড়াতে পারল না।

যাই হোক, সেরাত্রে কিছুক্ষণ আমাব বাড়িতে কাটিয়ে মৃগাঙ্কমোহন বিদায় নিল বটে, কিন্তু পরেব দিনই দ্বিপ্রহবে সে আবার এসে হাজির হলো।

বাড়িতে ছিলাম না সে সময় আমি। বোজকাব মতই একটা কাজের ধান্ধায় বের হয়েছিলাম। ফিবে এসে দেখি মৃগাঙ্কমোহন আর হিমানী ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছে।

॥ পাঁচ ॥

কতক্ষণ হে মৃগাঙ্ক?

অনেকক্ষণ। তোমার জন্যই বসে অপেক্ষা করছি।

আমার জন্য অপেক্ষা করছ? কি ব্যাপার বল তো? একটু যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে কালীপ্রসন্ন।

গড়িয়াহাটায় আমার একটা ছোটোখাটো কাঠের ব্যবসা আছে। ব্যবসাটা দেখবার অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর—

কি রকম?

সেই কথা বলবার জন্যই তখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

বল কি, এ যে রীতিমত সুসংবাদ হে!

মৃগাঙ্কমোহন হাসে।

রাজার মত যেমন সুন্দর চেহারা, মৃগাঙ্কমোহনের হাসিটিও তেমনি সুন্দর।

সুসংবাদ কিনা জানি না, তবে তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর তো ভাগ্য বলে জানবো। তবে এটা ঠিক—আমার ব্যবসায় তোমাকে সাহায্য করতে বলছি বলে মনে করো না মাইনে দিয়ে কর্মচারী হিসাবে তোমাকে পেতে চাই আমি—

তবে কি?

তোমাকে ভাবছি ব্যবসাটার হাফ্ পার্টনার করে নেবো। মানে, ওয়ার্কিং পার্টনার। আমার মূলধন, তোমার শ্রম। বুঝতে পারছ বোধহয়, আমি কি

বলছি? ব্যবসার যা-কিছু তুমিই দেখাশুনা করবে—কেবল টাকা সাপ্লাই করবো আমি। লাভের অর্ধেক তোমার—অর্ধেক আমার।

দেখাশোনা করবো, তার জন্য অর্ধেক লাভ আমার? কেমন যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকায় কালীপ্রসন্ন মৃগাঙ্কমোহনের মুখের দিকে।

কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি কালী। অনেক টাকাই ঢেলেছি আজ পর্যন্ত ব্যবসাটায়, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েতেই খেয়ে নিচ্ছে দেখছি। তাই ঐ মতলব করেছি। যতই মাইনে দিয়ে লোক রাখি না কেন, সে মাইনের বেশি করবে না। তাই ঠিক করছি লাভের অংশ দেবো। পার্টনার নেবো কারবারে, ম্যানেজার আর রাখবো না।

আমি চুপ করে থাকি।

মৃগাঙ্কমোহন শুধায়, কি, কিছু বলছো না যে?

কি বলবো?

রাজী কিনা তুমি আমার প্রস্তাবে তাই।

কিন্তু—

এতে আবার কিন্তুর কি আছে হে?

আছে বৈকি।

বলে ফেল।

বললেও তুমি ঠিক বুঝবে না। আমাকে কটা দিন ভাববার সময় দাও ভাই।

বেশ, কবে জানাবে বল?

দু-চার দিন পরে।

তবে আজ উঠি।

এসো।

মৃগাঙ্ক চলে গেল।

প্রথমে মনটা কিন্তু কিন্তু করেছিল মৃগাঙ্কমোহনের প্রস্তাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সে মনের কিন্তুকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তাছাড়া হিমানীও বলতে লাগল, রাজী হয়ে যাও। এমন সুবিধা আর তুমি কোথায় পাবে?

কিন্তু মন যে সায় দিচ্ছে না হিমি।

মনকে বিশ্বাস করো না। তাছাড়া মৃগাঙ্কবাবু তোমার ছোটবেলার বন্ধু না?

হ্যাঁ, বন্ধু। তবে সেদিন আমাদের পরস্পরের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্যটা এমন করে মনকে প্রতি মুহূর্তে তো সজাগ করে দেয় নি। তাই বলছি—

অত ভাবাভাবির কি আছে? না পোষায়, অসুবিধা দেখো, ছেড়ে দিলেই হবে তখন।

বুঝলাম মৃগাঙ্কমোহনের প্রস্তাবে আমি রাজী হই হিমানীর পুরোপুরি ইচ্ছাই তাই।

মৃগাঙ্কও অনুরোধ জানাতে লাগল বারবার এসে এসে—রাজী হয়ে গেলাম তার প্রস্তাবে। নিয়ে গেল সে একদিন তার কাঠের কারখানায়। গিয়ে দেখলাম কিছুটা অত্যুক্তি ছিল তার কথার মধ্যে।

ব্যবসাটা আদৌ ছোটখাটো নয়, রীতিমত শাঁসালো এবং ফলোয়া ব্যবসা। তার ম্যানেজার জীবনবাবুও যে চুরি করতো না তা নয়। সে বরং দুহাতেই সরাচ্ছিল।

মৃগাঙ্কমোহন বললে, একটা লেখাপড়া করে নিতে চাও নাকি?

না, না—তার প্রয়োজন কি?

চাও যদি, করে দিতে পারি।

আমার ইচ্ছা ছিল না লেখাপড়া কিছু করবার, কিন্তু হিমানীর তাগিদেই করে নিতে হলো একটা লেখাপড়া।

দিন পনোরোর মধ্যেই লেখাপড়া হয়ে গেল।

কাজটা নতুন আমার অভিজ্ঞতায়, তাই বুঝে নিতে মাসখানেক সময় লেগেছিল।

মৃগাঙ্ক মধ্যে মধ্যে আসতো। কারবার কেমন চলছে কি বৃত্তান্ত সেসব কিছুই জিজ্ঞাসা করতো না। কেবল জিজ্ঞাসা করতো টাকার দরকার আছে কিনা। টাকার প্রয়োজন থাকলে সে চেক দিয়ে যেত।

সকালবেলা আসতাম চলে কারখানায়—ফিরতাম সেই রাত দশটায়।

কোন কোন দিন তারও পরে। কেমন এমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল।

মাস ছয়েকের মধ্যেই কারবারকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ফেললাম। আয়ের অঙ্কও বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে বস্তি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় উঠে চলে এসেছিলাম। মৃগাঙ্করই অনুরোধে। কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্যের চাকাও তখন ঘুরে চলেছে। আমি নিশ্চিন্ত। হিমানী খুশি।

তার নিত্যনতুন শাড়ি-গহনা আসছে। তার রূপও যেন আরও খুলছে তখন দিনের পর দিন।

ইচ্ছা হতো, মধ্যে মধ্যে তাকে নিয়ে একটু আদর করি, কিন্তু সময় কোথায়।

কারবার তখন আমার মাথার মধ্যে যেন ভূতের মতই চেপে বসেছে।

কি করে কারবারের আরো উন্নতি হবে একমাত্র সর্বক্ষণ সেই আমার চিন্তা।

মোটা লভ্যাংশ আসছে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স উত্তরোত্তর ফেঁপে উঠছে, জায়গা কিনব—বাড়ি করবো—সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে লোভের হাতছানি নিত্যনতুন।

এবং কোথা দিয়ে যে দেড়টা বছর চলে গেল জানতে পারি নি।

জানতে পারলাম যেন অকস্মাৎ একদিন রাত্রে এক মর্মান্তিক আঘাতে।

ঘর গড়ে তোলার নেশায় যখন বুঁদ হয়েছিলাম, তখন যে একটু একটু করে ক্ষয়ে চলেছে ঘরের ভিতরটাই আমার, সেই কথাটাই জানতে পারি নি।

মৃগাঙ্কমোহন। বন্ধু মৃগাঙ্কমোহন যে এদিকে দাক্ষিণ্যের হাত আমার প্রতি প্রসারিত করে অন্য দিকে সেই দাক্ষিণ্যের তলে তলে আমার সর্বস্ব লুঠ করে ফেলেছে, সেই কথাটাই জানতে পারি নি।

জানলাম যখন, তখন একেবারে পাথর হয়ে গেলাম।

কারবারের ব্যাপারে দিন দশেকের জন্য আমাকে নাগপুরে যেতে হয়েছিল।

বাড়িতে একজন ঝি আর একজন চাকর আছে, তাদের 'পরেই ভরসা করে গিয়েছি। তারা বিশ্বাসী।

তাছাড়া মৃগাঙ্ক বলেছিল, মধ্যে মধ্যে সে খোঁজ নেবে।

কোন চিন্তা ছিল না।

কথা ছিল দিন দশেক পরে ফিরবো, কিন্তু হঠাৎ শরীরটা অসুস্থ হওয়ায় চার দিনের দিন সন্ধ্যার প্লেনে চলে এলাম।

রাত নয়টা নাগাৎ বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর অনেকদিন মনে হয়েছে, সেদিন যদি না আসতাম তো কি এমন ক্ষতি হতো! কিংবা যদি ফিরতি পথে প্লেন-ক্র্যাসে মৃত্যু হতো!

হায় ভগবান, কেন মৃত্যু দিলে না! সেদৃশ্য দেখার আগে কেন চোখ দুটো আমার অন্ধ হয়ে গেল না!

পরে এও ভেবেছি, অন্ধ হয়ে গেলে তো চোখ আমার খুলত না।

নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে অন্যের অঙ্কশায়িনী এক ভ্রষ্টা নারীকে নিয়েই জীবনের আরো অনেকগুলো দিনই আমার হয়তো কেটে যেতো।

ঈশ্বরকে তাই ধন্যবাদ দিয়েছি। চরম আঘাতের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, তার জন্য বারবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

সুনন্দ, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, তোমাকে সেকথা বলতে পারবো না। বর্ণনা করতে পারবো না সে কুৎসিত দৃশ্য তোমার কাছে।

শুধু সেদিন মনে হয়েছিল, এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে মুখে কেমন করে মানুষ করতে পারে!

মনে হয়েছিল, লালসার পঙ্কে কোন নারী কি অমনি করে নির্লজ্জার মত নিমজ্জিত হতে পারে!

পৃথিবীতে সততা বলে কি কোন কিছুই নেই! বন্ধুত্বের বিশ্বাসের কি কোন মূল্যই নেই! এই যদি মানুষের পরিচয় হয়, এই যদি বিশ্বাসের শেষ কথা হয় তো কোন্ মাটিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

কোন্ আশ্বাসে আজো আমরা পাশাপাশি বাস করছি পরস্পর!

আর সেই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাগলের মতই ছুটে নিঃশব্দে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সারাটা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে জ্বলছে ঘৃণা আক্রোশ আর লজ্জার এক খাণ্ডবদহন যেন।

একটা রাত নয়—তারপরও তিনটে দিন ও তিনটে রাত সমস্ত শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি।

ভগবান, ভুলতে দাও আমাকে, ভুলতে দাও। শুধু একটি মাত্র প্রার্থনাই জানিয়েছি।

সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা! নিদারুণ মর্মজ্বালা!

অবশেষে সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত জ্বালা নিভে গেল—সমস্ত বুকটা ভরে গেল এক কঠোর প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞায়।

হ্যাঁ, মৃগাঙ্কমোহন যেমন আমার ঘর ভেঙে দিয়েছে, তারও ঘরে আমি আগুন ধরিয়ে দেবো।

নিশ্চিহ্ন করে দেবো তার বংশ। প্রতিহিংসার আগুনে যেন সব জ্বালা আমার নির্বাপিত হয়ে এলো।

চতুর্থ রাত্রে ফিরে চললাম বাড়িতে। হিমানীর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করতে হবে।

রাত তখন বোধহয় দশটা। ঝি দরজা খুলে দিল। আমার চেহারার দিকে চেয়ে ঝি পর্যন্ত সেদিন চমকে উঠেছিল।

কি হয়েছে বাবু?

তোর মা কোথায় রে ?

এই তো ফিরলেন, উপরে আছেন।

ফিরলেন ? কোথায় গিয়েছিলেন ?

মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালাম, মানদা !

কি বাবু ?

হাতটা নিসপিস করছিল মানদার গলাটা টিপে ধরতে, কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে।

বললাম, না কিছু না। তুই যা—

মনে হলো ঝি যেন দাঁড়াল। কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু আমি আর ওর দিকে ফিরেও তাকালাম না।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি শয্যায় আড় হয়ে শুয়ে হিমানী।

সর্বাঙ্গে দামী বেশভূষা ঝলমল করছে, তার উপরে প্রসাধন—যেন ইন্দ্রাণীর মত দেখাচ্ছিল হিমানীকে। মনের সেই অবস্থায়ও তার সেই মোহিনী রূপের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, মুহূর্তের জন্য বুঝি সব ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ঐ রূপের জন্য বুঝি সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়।

কে ! কে ওখানে ?

হিমানীর কণ্ঠস্বরে যেন আবার সংবিৎ ফিরে এলো। দরজার উপরেই বারান্দায় আবছা আলো-ছায়ার মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ বুঝি হিমানী চমকে উঠেছিল।

সাড়া দিলাম না, তবে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম

ওঃ, তুমি ! যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ। একি চেহারা হয়েছে তোমার ! কি হয়েছে ? কখন এলে ? এই ফিরলে বুঝি ?

এলোমেলো কথা বলে যায় হিমানী।

আর আমি তখন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি হিমানীর প্রসাধন করা মুখের দিকে।

বুকের মধ্যে জ্বলছে আগুন। সমস্ত দেহে বিষাক্ত একটা জ্বালা।

হিমানী !

ইন্দ্রানীর মত সুন্দরী ঐ নারী—হিমানী আমার স্ত্রী।

কি হলো ? অমন করে চেয়ে আছো কেন আমার মুখের দিকে ?

হঠাৎ কেমন যেন কাঁপা কাঁপা গলায় হিমানী বলে।

মনে হলো বুঝি কেমন ভয় পেয়েছে।

বললাম, ভয় পেয়েছিলে বুঝি হিমানী হঠাৎ আমাকে দেখে?

ভয় পাবো না! হঠাৎ অন্ধকারে—

নিঃশব্দে হাত দিয়ে ঠেলে খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে আবছা অস্পষ্ট যে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, তাকেই তো বরং ভয় করে না হিমানী! এগুতে এগুতে বললাম।

কি বললে?

বলছিলাম যে, অন্ধারে দাঁড়িয়ে সে-ও যেমন কিছু জানতে পারে না, তেমনি তাকেও অন্যে দেখতে পায় না। দেখতে না পেলে আবার ভয়ের কি?

গলার স্বরে হয়তো আমার এমন কিছু ছিল, তাছাড়া আমার সেদিনকার চেহারা—হিমানীর চোখে-মুখে তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন একটা আশঙ্কা কালো ছায়ার মত থমথম করে ওঠে। সে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হিমানী!

কোন সাড়া না দিয়ে ও আমার মুখের দিকে তাকাল।

।। ছয় ।।

কি হলো হিমানী, শুনতে পাচ্ছ না?

তুমি, তুমি—বোস। কাঁপা গলায় অতি কষ্টে যেন কথাটা বললে হিমানী।

মনে হচ্ছে, সত্যিই তুমি হঠাৎ এসময় আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। কাঁপছে তোমার বুকের ভিতরটা। কিন্তু কেন, কেন বল তো? কিসের ভয় তোমার? আমাকে তোমার কিসের ভয়—

কথাটা বলতে বলতে আমি ওর দিকে এগুতে লাগলাম।

পায়ে পায়ে এগুতে লাগলাম।

হঠাৎ ঐ সময় তীক্ষ্ণ চাপা আর্তকণ্ঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে হিমানী, না, না, না—

ছিঃ, ও কথা বলে না, বল হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলতে বলতে সহসা দুহাত বাড়িয়ে যেন বাঘের মত কঠিন মুঠিতে ওর নরম কোমল শ্বেতশুভ্র দুই বাহুমূল চেপে ধরলাম।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে হিমানী।

হঠাৎ যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

সমস্ত মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে যায়।

আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দুচোখের স্থির দৃষ্টি আমারই মুখের 'পরে নিবদ্ধ।

হিমানী আমার মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলে ওঠে, ছাড়—ছাড় আমাকে। তুমি আমাকে। তুমি অমন করছে কেন?

হিমানী—

না, না—

সত্যি, তুমি কি সুন্দর! oh! what a beauty।

ছাড়।—ছাড় আমাকে! যেতে দাও —

পাগলের মতই যেন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপরই হাসি থামিয়ে ওকে ঝাঁকুনী দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, বল, বল—স্পীক—স্পীক আউট হিমানী, স্পীক আউট। ভুললে কি করে, ভুললে কি করে যে তুমি একজনের স্ত্রী! কি, কি দিয়েছে তোমাকে মৃগাঙ্কমোহন—কত শাড়ি, কত গহনা, কত টাকা? বল, বল—

হঠাৎ যেন ছিন্নমূল লতার মত জ্ঞান হারিয়ে আমার পায়ের কাছে এলিয়ে পড়ল হিমানী।

কে যেন দুর্বার শক্তিতে আমার হাত দুটো পায়ের কাছেই ভূলুণ্ঠিতা হিমানীর নরম কোমল শঙ্খধবল গ্রীবার দিকে টানতে লাগল।

ধরেছিলামও গলাটা তার দুহাত দিয়ে। কিন্তু কই, পারলাম না তো, পারলাম না তো সেদিন তাকে শ্বাসরুদ্ধ করতে।

মনে হলো, সে যে আমার স্ত্রী। অগ্নি নারায়ণ-শীলা সাক্ষী রেখে যে তাকে একদিন গ্রহণ করেছিলাম।

সমস্ত অন্তর দিয়ে যে ভালবেসেছিলাম। যে-হাতে তাকে একদিন কত আদর কত সোহাগ করেছি—পারলাম না তাকে সেই হাতেই শেষ করে দিতে।

উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু এখানে থেকেই বা আর কি হবে?

হিমানী অজ্ঞান, অচৈতন্য পড়ে রইলো ঘরের মেঝেতে, আমি আবার বের হয়ে পড়লাম রাস্তায়। কিন্তু কোথায় যাবো?

ঘর তো ভেঙে গেল। মৃগাঙ্কমোহন ঘর আমার ভেঙে দিল।

মৃগাঙ্কমোহন! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল মৃগাঙ্কমোহনকে, আর দপ্ করে যেন নতুন করেই আবার প্রতিহিংসার আগুনটা বুকের মধ্যে জ্বলে উঠলো।

আবার সেই দুঃসহ যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে যেন ছুঁচ বিঁধাতে শুরু করল।

হন হন করে হাঁটতে শুরু করলাম শ্রীরামপুরের দিকে।

মাসকয়েক পূর্বে সে মাত্র বাড়িটা কিনেছে শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারে, শুনেছিলাম বর্তমানে সে সেই শ্রীরামপুরের বাড়িতেই থাকে। একাই থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একসময় মনে হলো, না, এ বেশে, এ চেহারায় তো তার কাছে যাওয়া চলবে না। তাকে জানতে দেওয়া তো হবে না ধরা পড়ে গিয়েছে সে আমার কাছে।

কারখানায় ফিরে গেলাম। সেখানে একটা ঘরে আমার একপ্রস্থ জামা-কাপড় সব থাকত।

দাড়ি-গোঁফ কামালাম, স্নান করলাম, বেশ পরিবর্তন করলাম। পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীরামপুরে রওনা হলাম।

শ্রীরামপুরে মৃগাঙ্কমোহনের গৃহে পৌঁছে দেখি, সে একটা টেলিগ্রাম হাতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ঘরের মধ্যে একাকী পায়চারি করছে।

আমাকে ঐ সময় দেখে মৃগাঙ্ক যেন চমকে ওঠে। বলে, একি! তুমি!

হ্যাঁ—নাগপুর থেকে ফিরেই তোমার কথা মনে হলো, তাই চলে এলাম।

কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন মৃগাঙ্কমোহন আমার দিকে তাকাল। তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার শুধাল, কবে ফিরলে নাগপুর থেকে?

কাল রাত্রে।

কাল রাত্রে? কখন?

তা, অনেক রাত্রে—প্লেনটা ঘণ্টা তিনেক লেট ছিল।

ওঃ, তা আমি এদিকে বড় বিপদে পড়েছি। আমার স্ত্রী—মহাশ্বেতা খোকন আর বাচ্চু আমার আমার দুই ছেলেকে নিয়ে অনেকদিন পর তার বাপের বাড়ি কোঁয়ারপুরে গিয়েছিল, আমার শাশুড়ীর মরণাপন্ন সংবাদ পেয়ে। হঠাৎ সেখানে চারিদিকে বন্যায় সব ডুবে গিয়েছে—টেলিগ্রাম পেলাম মাত্র কিছুক্ষণ আগে।

বল কি! তাহলে?

তাই ভাবছি। আমাকে আবার একটা জরুরী ব্যাপারে কালই বম্বে কিছুদিনের জন্য যেতে হবেই—না গেলে বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা মতলব এসে যায়। বলি, তাতে এত চিন্তার কি আছে? আমি না হয় গিয়ে তাদের নিয়ে আসছি—

যাবে? পারবে তুমি তাদের নিয়ে আসতে কালী?

কেন পারবো না?

তাহলে আজই চলে যাও দুপুরের ট্রেনে। এখান থেকেই আমার গাড়িতে করে সোজা কলকাতায় গিয়ে ট্রেন ধরো। আমি তোমার বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দেবো'খন।

বেশ, তাই দিও।

ঐ দিনই ট্রেনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে গেলাম।

ওখানে পৌছে দেখি বন্যা হয়েছে বটে, তবে এমন কিছু না। তবে বন্যার জল যদি আরো বৃদ্ধি পায়, তাই ভয় পেয়ে স্বামীকে তার করেছিল মহাশ্বেতা।

আমাকে দেখে মহাশ্বেতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

বলে, যাক, আপনি এসেছেন ঠাকুরপো, বাঁচলাম। যা ভয় হয়েছিল—

আমি মৃদু হাসলাম প্রত্যুত্তরে।

তাহলে আর দেরি নয় ঠাকুরপো—আজই আমরা বেরিয়ে পড়ি, কি বলুন?

বেশ তো, চলুন। তাহলে আমি একটা নৌকা ভাড়া করে আসি—

হ্যাঁ যান।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রচুর বকশিসের লোভ দেখিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করে ফিরে এলাম।

ঠিক হলো তারপাশায় গিয়ে নৌকার মাঝি আমাদের ষ্টীমার ধরিয়ে দেবে।

দ্বিপ্রহরের দিকে রওনা হলাম মহাশ্বেতা ও তার দুই ছেলেকে নিয়ে।

চারিদিকে জল আর জল।

অফুরন্ত ঘোলাটে জল যেন ক্রুদ্ধ ফেনিল আবর্তে চারিদিকে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে।

আমার মতলব পূর্বাহ্নেই মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। বসে রইলাম চুপ-চাপ বাইরে। ওরা ভিতরে রইলো।

দেখতে দেখতে চারিদিকে কালো করে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

দুজন দাঁড়ী দাঁড় টানছে, মাঝি হাল ধরে বসে আছে।

মাথার ওপরে কালো আকাশ, নীচে কালো জল।

মহাশ্বেতা নিশ্চিন্তে নৌকার মধ্যে তার সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই সুযোগ। নিঃশব্দে মাঝির সামনে এগিয়ে গেলাম।

ডাকলাম, মাঝি, তারপাশা আর কতদূর?

বেশি দূর আর নয়। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবো।

এ নৌকাটার কত দাম হবে তোমার মাঝি?

পুরাতন নাও কর্তা, কত আর দাম হবে!

আমি যদি তোমাকে দুহাজার টাকা দিই—

কর্তা—

হ্যাঁ—যদি দুহাজার টাকা দিই, এখুনি পারবে এই নৌকাটা ডুবিয়ে দিতে?

সেকি কর্তা! মা-ঠারেন, বাচ্চারা নাওয়ের মধ্যে আছে—

তা থাক। সেকি কর্তা! মা-ঠারেন, বাচ্চারা নাওয়ের মধ্যে আছে—

তা থাক। তাতে তোমার কি? নৌকা ডুবলেও তো তুমি বা তোমার লোকেরা ডুববে না। নৌকাটাও পুরাতন—

না, না, কর্তা—সে যে বড় পাপ।

তিন হাজার টাকা দেবো।

কর্তা—

ভেবে দেখো—তিন হাজার টাকা। এই দেখো—বলতে বলতে পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে সামনে ধরলাম।

অর্থের লোভ। সাধ্য কি তিন হাজার টাকার লোভ ঐ সামান্য এক দুঃখী, দীনদরিদ্র সংবরণ করে।

চোখের সামনেই আমার নৌকা ডুবে গেল।

জানতাম না যে মহাশ্বেতা সাঁতার জানত। মাঝি ও দাঁড়ী নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরে পাড়ের দিকে এগুতে লাগল।

আমিও পাড়ের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম।

কিন্তু কি সে জলে স্রোতের টান!

মহাশ্বেতা জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বারবার আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল, কিন্তু সাড়া দিলাম না আমি। পাড়ের দিকে সাঁতরে চললাম।

পরে দেখছিলাম খোকন ও বাচ্চু দুজনকে একসঙ্গে সে বাঁচাতে পারে নি, তার বড় ছেলেটিকে—খোকন অর্থাৎ হীরককে কোনমতে বুকে করে সাঁতরে সাঁতার অনেক দূরে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিল।

পরের কথা থাক। আগে সে রাত্রের কথাই বলি।

অন্ধকারে সাঁতরে চলেছি, হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কায় কি একটা আমার গায়ে এসে জড়িয়ে ধরলো।

প্রথমে ভেবেছিলাম মাছ বা সাপ-টাপ কিছু হবে। সরিয়ে দিতে গিয়ে হাত দিয়ে ছোট একখানি নরম হাত আমার গায়ে ঠেকল।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা।

প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে সে দুহাত দিয়ে তখন আমাকে।

নিজেকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিতে গিয়েও পারলাম না।

অবোধ, নিরপরাধ শিশু, পারলাম না তাকে সেই জলে ভাসিয়ে দিতে। বুকের মধ্যেই টেনে নিলাম।

তারপর সাঁতরাতে লাগলাম অন্ধকারে তাকে বুকের মধ্যে এক হাতে আপটে ধরে।

স্রোতের টানে অনেক দূর ভেসে গিয়ে ডাঙায় উঠে দেখি সে বাচ্চু। তুমি।

.

ঘুরতে ঘুরতে তোমাকে নিয়ে পনেরো দিন বাদে আবার এসে কলকাতা শহরেই উঠলাম।

কিন্তু তোমার তখন খুব জ্বর।

তোমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর কি চার বছর।

দেড় বছর একটানা তুমি ভুগেছিলে।

প্রথম প্রথম মা-র জন্য তুমি কাঁদতে, ক্রমশঃ একটু একটু করে ভুলে গেলে তুমি তোমার মাকে।

কলকাতায় ফিরে এসে দুটো সংবাদ পেয়েছিলাম।

হিমানী বিষ খেয়ে পরের দিন রাত্রেই আত্মহত্যা করেছিল, আর মহাশ্বেতা কোনমতে দিন দশেক বাদে তার বড় ছেলে খোকনকে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁচেছিল।

আরো দিন সাতেক বাদে মৃগাঙ্কমোহন বম্বে থেকে ফিরে এলো।

একবার সেই সময় ভেবেছিলাম, তোমাকে আবার তোমার মা-র বুকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসবো, কিন্তু সাহস হলো না।

যদি মহাশ্বেতা সন্দেহ করে আমাকে!

পাপের মন যে আমার! তাছাড়া ঐ দেড় বছরে তোমার উপরে কেমন যেন একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল আমার।

যে জীবনটা মনে হয়েছিল ব্যর্থ, শূন্য একট হাহাকারে ভরা, সেই জীবনটাই যেন তোমাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে অকস্মাৎ সেদিন মনে হয়েছিল কানায় কানায় ভরে গিয়েছে বুঝি।

অস্বীকার করবো না আজ সুনন্দ, তোমার কচি কোমল দুটি হাত দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে তুমি যেন জীবনে আমার এনে দিয়েছিলে এক নতুন স্বাদ। নতুন গন্ধ।

আমি আবার বেঁচে উঠলাম। নতুন করে—নতুন এক মানুষ।

পৃথিবীটা যে কেবল শয়তানী আর বিশ্বাসঘাতকতারই জায়গা নয়, তোমাকে পেয়ে সেই শিক্ষাই আমার হলো। জানলাম, পৃথিবীতে ভালবাসাও আছে।

তুমি সব ভুলে গেলে।

আমার ঘরে তুমি মানুষ হতে লাগলে। আর তোমার জন্যই আমাকে মৃগাঙ্কমোহন, মহাশ্বেতা ও তোমার ভাইয়ের খোঁজ রাখতে হয়েছে সর্বদা।

বিচিত্র চরিত্র মৃগাঙ্কমোহনের।

মহাশ্বেতার মতো স্ত্রী পেয়েছিল সে, তোমার মতো সন্তান পেয়েছিল। আর পৈতৃক সূত্রে যে অর্থ সে করেছিল সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনটা সে কাটিয়ে দিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মৃগাঙ্ক চেয়েছিল আরো অর্থ, মুঠো মুঠো টাকা।

আর সেই টাকা পাওয়ার জন্য সে নেমেছিল জাল-জোচ্চুরি আর চোরা-কারবারে। আফিম আর কোকেনের চোরা-কারবারটাই ছিল তার আসল কারবার।

কাঠের কারবারটা ছিল তার একটা আই-ওআস মাত্র।

আফিম আর কোকেনের চোরা-কারবারে তার প্রধান সহায় ছিল এক পাঠান। আমীরুল্লা খান।

মৃগাঙ্কমোহনের পূর্বপুরুষরাও ছিল ডাকাত। ডাকাতী করেই তারা ঐশ্বর্য করায়ত্ত করেছিল।

পূর্বপুরুষের পাপই বোধকরি মৃগাঙ্কমোহনের রক্তে সক্রামিত হয়ে তাকে ঐ দুর্নীতির পথে এক অন্ধ নেশায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

মহাশ্বেতা অনেক চেষ্টা করেছিল মৃগাঙ্কমোহনকে ফেরাবার, কিন্তু পারে নি। এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীর ব্যাপারে সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল হতাশ হয়েই।

চোরা-কারবারের লাভের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে শেষ পর্যন্ত এক রাত্রে আমীরুল্লার

হাতে ভীষণভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃগাঙ্কমোহন গৃহে ফিরে আসে। এবং তাইতেই দিন পাঁচেক বাদে তার মৃত্যু হয়।

মৃগাঙ্কমোহনের বড় ছেলে তোমার ভাই হীরকের বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র।

কলকাতার কলেজে পড়ছে। চমৎকার ছেলে।

মৃগাঙ্কমোহনের মৃত্যুর বছর দেড়েক বাদে বি. এ. পাস করার পর মহাশ্বেতা হীরকের বিয়ে দিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ে হলো আমারই এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের একমাত্র মেয়ে কাঞ্চনার সঙ্গে।

কাঞ্চনাকে তুমি দেখ নি।

বিয়ের রাত্রে বিবাহ-বাড়িতে গিয়েই ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। আর সেই বিবাহ-রাত্রেই দীর্ঘ আঠারো বছর পরে মহাশ্বেতা ও আমার পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো।

গত আঠারো বছরে আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভেবেছিলাম মহাশ্বেতা হয়তো আমাকে দেখলেও চিনতে পারবে না।

কিন্তু ঠিক সে চিনেছিল। এবং বিবাহ-সভা থেকে আমাকে ডেকে পাঠাল অন্দরে।

তুমি তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছ মহাশ্বেতা?

জীবনে একবার যাদের আমি দেখেছি, তাদের কখনো আমি ভুলি না কালী-প্রসন্নবাবু।

সে আমাকে কালীপ্রসন্নবাবু বলেই সম্বোধন করলো। ঠাকুরপো বলে নয়।

॥ সাত ॥

কিছুক্ষণ তারপর কারো মুখেই কোন কথা নেই।

মহাশ্বেতাই কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, আমি অবিশ্যি জানতাম।

কি? কি জানতে তুমি?

মৃদু হেসে মহাশ্বেতা বললে, সে রাত্রে আপনি নির্বিঘ্নে সাঁতরে গিয়ে তীরে উঠে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আজ একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

কি?

কেন সেদিন আমাদের আপনি ডুবিয়ে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কালীপ্রসন্নবাবু ?

তুমি সেকথা বুঝতে পেরেছিলে তাহলে মহাশ্বেতা ?

পেরেছিলাম বৈকি। তবে সেদিন বুঝতে পারি নি। পরে ব্যাপারটা চিন্তা করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম।

সে প্রশ্নের জবাবটা তুমি আমার কাছে চেও না মহাশ্বেতা।

কেন বলুন তো ?

কারণ, অতীতকে ঘাঁটিয়ে আজ আর কারো পক্ষেই কোন লাভ নেই। তাতে করে তোমার মনের অশান্তিই বাড়বে।

তাহলে জানবেন, আপনাকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবো না।

কিছুমাত্র তাতে করে আমার এসে যাবো না। আচ্ছা, আমি চলি—কথাটা বলে আর এক মুহূর্তও সেখানে আমি দাঁড়াই নি।

তারপর আর মহাশ্বেতার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

কিন্তু তোমার মা মহাশ্বেতার কথা আমি ভুলতে পারি নি। সে স্বর্গের দেবী। তুমি যে চৌধুরীবংশের পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছ, সেও হয়তো ঐ মহিয়সী নারীরই পুণ্যের জোরে।

যাক্, যা বলছিলাম, আমি জানতে চাই তোমাকে তোমার সহোদরের কথা। যমুনাপ্রসাদ, মঙ্গল বা হীরক চৌধুরীর কথা।

কলকাতায় কলেজে পড়ার সময়ই সে দুটি নেশা রপ্ত করেছিল, রেস খেলা ও জুয়া খেলা।

সেই জুয়া খেলার আসরেই কলকাতা শহরের কোন এক কুখ্যাত পল্লীতে, কোন এক কুখ্যাত হোটেলে মৃগাঙ্কর চোরা-কারবারের সহকারী আমীরুল্লার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

আমীরুল্লার সঙ্গে হীরকের পরিচয় হয়েছিল বটে কিন্তু সে সময় আমীরুল্লা হীরকের সত্যিকারের নাম ও পরিচয়টা জানত না।

জানত না যে হীরক তার আসল নাম।

হীরকও তার আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা সর্বদা সযত্নে গোপন করেই চলত সর্বত্র।

দলের লোকেরা তাকে যমুনাপ্রসাদ বলে জানত।

আমীরুল্লাও তাকে ঐ নামেই জানত।

ঐ দলের বেশির ভাগ লোকেরাই ছিল ইউ. পি. এবং পেশোয়ার ও পাঞ্জাবের লোক।

তাদের সঙ্গে মিশে মিশে হীরকও চোস্ত হিন্দি ও উর্দু বলতে পারত।

বেশভূষাও ছিল তাদেরই মতো। কাজেই কেউ ধরতেই পারত না যে যমুনা-প্রসাদ ওর আসল নাম নয় এবং আসলে ইউ. পি.-র লোক নয় খাঁটি বাঙ্গালীই। যা হোক যা বলছিলাম।

আমীরুল্লা খান বয়সে তখন প্রৌঢ় হলেও শয়তানদের রাজা সে তখনও।

দুর্ধর্ষ স্মাগ্‌লার আমীরুল্লা খানকে আমি মৃগাঙ্কমোহনের কাছে দু-চার বার আসতে দেখেছি, তখন থেকেই তাকে আমি চিনতাম।

পূর্বেই তোমাকে বলেছি, হীরকের উপরে আমি নজর রেখেছিলাম, বিশেষ করে কাঞ্চনার সঙ্গে বিয়ের পর আরো নজর দিয়েছিলাম।

হীরক বেশির ভাগ সময়ই থাকত তাদের কলকাতার ঝাউতলার বাড়িতে।

ঝাউতলার সেই বাড়ি থেকেই একদিন আমীরুল্লা খানের সঙ্গে হীরককে বের হতে দেখে মনটা আমার কেমন সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত হয়ে ওঠে। এবং আমীরুল্লা খানের সঙ্গে তাকে দেখে খবর নিতে গিয়েই জানলাম সে আমীরুল্লার দলে ভিড়েছে।

সেই সময়ই জেনেছিলাম কলেজে পড়ার সময়ই হোটেলের এক জুয়ার আড্ডায় আমীরুল্লার দলে ভিড়েছে।

আরো সংবাদ পেলাম হীরকের স্ত্রী কাঞ্চনা শ্রীরামপুরেই থাকে। এবং কাঞ্চনার সঙ্গে হীরকের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।

চিঠি দিয়ে কাঞ্চনাকে কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম।

আমার সঙ্গে দেখা হতে কাঞ্চনা কাঁদতে লাগল। বললে, এর চাইতে বাবা যদি আমাকে আদপে বিয়েই না দিত মামা—

আমাকে সব কথা খুলে বল মা! হীরক কি তোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে?

বিয়েই হয়েছে আমাদের, আর তো কোন সম্পর্কই সে রাখে নি আমার সঙ্গে!

তোর শাশুড়ী একথা জানে?

জানেন বৈকি! জেনে-শুনেই তো তিনি আমার এ সর্বনাশ করেছেন।

তিনি বাধা দেন না কেন?

কাকে বাধা দেবেন? সে কি কারো কথা শোনে?

আমীরুল্লা খানের উপরে দীর্ঘদিন ধরে পুলিসের নজর ছিল, কিন্তু কোনমতেই তাকে যেন তারা কায়দা করতে পারছিল না। কারণ, আমীরুল্লা কখনো কোন

কাজ নিজের হাতে করত না এবং কোন দুষ্কৃতির সঙ্গেই সে সাক্ষাৎভাবে জড়িত থাকত না।

তার দলের লোকেরা তারই নির্দেশমত কাজ করত, কিন্তু সে থাকত সর্বদা দূরে —সমস্ত স্পর্শ বাঁচিয়ে, আইন বাঁচিয়ে, আড়ালে।

কাঞ্চনার মুখে সমস্ত খবর পেয়ে ও হীরক সম্পর্কে সমস্ত খোঁজ নিয়ে কাঞ্চনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার দুশ্চিন্তার যেন অবধি রইলো না।

কেমন করে হীরককে ঐ পথ থেকে ফেরাবো, সর্বক্ষণ সেই চিন্তাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

অবশেষে অনেক ভেবে অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে হীরকের সঙ্গে দেখাই করব স্থির করলাম ওর কলকাতার বাড়িতেই। কিন্তু সে সুযোগ আর আমার হলো না।

পুলিসের সঙ্গে ঐ সময় একটা সংঘর্ষ হলো হীরকের। এবং সেই সংঘর্ষের সময় একটা অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ফেটে গিয়ে হীরক নিজেই গুরুতরভাবে আহত হলো। আহত হীরককে অনন্যোপায় আমীরুল্লা কলকাতা থেকে একেবারে লক্ষ্ণৌতে সরিয়ে ফেলল।

সেই সংঘর্ষের সময় হীরকের দলের আর একজন ঐ অ্যাসিডে গুরুতররূপে আহত হয়ে অকুস্থলেই মারা যায়।

আমীরুল্লা রটনা করে দিল যমুনাপ্রসাদেরই মৃত্যু হয়েছে।

দীর্ঘদিন ভুগেছিল হীরক ঐভাবে আহত হয়ে। এবং দীর্ঘ এক বছর বাদে হীরক ফিরে এলো কলকাতায় নতুন পরিচয়ে। তার নাম হলো এবারে মঙ্গল সিং।

অবিশ্যি বিশেষ পরিচিত জন ছাড়া আজ আর হীরককে যমুনাপ্রসাদ বলে চিনবারও উপায় ছিল না।

গালের একটা দিকে এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, তার মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে।

এবং মঙ্গল হয়ে উঠল আরো দুর্ধর্ষ। আরো দুর্বার। পুলিস মঙ্গলকে ধরবার জন্য আরো তৎপর হয়ে উঠলো।

বছর দুই বাদে আবার একটা সংঘর্ষ হলো হীরক বা মঙ্গলের সঙ্গে পুলিসের,. আবার সে ছ'মাসের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো।

সেই মঙ্গলকেই তুমি ব্যারাকপুরে ধরেছ।

এতদিন বাদে সভ্যসমাজের এক নিদারুণ বিভীষিকা ধরা পড়লো। এবং ধরা

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলাম, এবার আর হীরকের নিষ্কৃতি নেই। আর এও বুঝেছিলাম, বিচারক বিচার করে তার প্রতি চরম দণ্ডই দেবে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, আজ যখন তার বিচার চলবে আদালতে কোন অতীত কথাই হয়তো আর গোপন থাকবে না। সবই হয়তো জেরার মুখে প্রকাশ পাবে।

তুমি হয়তো বলতে পারো, প্রকাশ হয়তো নাও পেতে পারত। মিথ্যে নয়—অসম্ভবও নয়। তবু সে যে তোমার ভাই, সেকথা তোমাকে আজ জানাতে গেলাম কেন?

কোন ক্ষতিই তো হতো না যদি জীবনে ঐ কলঙ্ক-কথা তোমার কাছে অনুদ্‌ঘাটিতই থাকতো।

হয়তো হতো না সত্যিই। কিন্তু তাতে করে তো তোমার জীবনের পরম সত্যকে গোপন করে রাখবার যে অপরাধ এবং আমার পাপের, আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হতো না।

তোমাকে যে একদিন—শুধু তোমাকে কেন, তোমাদের সবাইকে একদিন দানবীয় প্রতিহিংসায় জলে ডুবিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, সেই পাপ থেকে তো আমার নিষ্কৃতি মিলত না। এবং তোমার সত্যকারের জন্ম-বৃত্তান্ত তোমার কাছ থেকে গোপন করে রেখে এতকাল তোমার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেছি, মাতৃ-অঙ্ক থেকে ছিনিয়ে রেখে তোমাকে যে তোমার প্রাপ্য মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি, তোমাকে যে এতকাল সকলের কাছে, জগতের কাছে, সমাজের কাছে পরিচয়হীন করে রেখেছি, সে পাপেরও তো ক্ষমা চাইবার ঈশ্বরের কাছে কোন অধিকারই আমার থাকত না।

তাই আরো প্রয়োজন বোধ করছি তোমাকে এ কাহিনী জানাবার।

তোমার মা মহাশ্বেতা—তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা অকপটে স্বীকার করবার সাহস আমার নেই। তাঁর কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই।

তাঁর কাছে আজ একমাত্র তুমিই গিয়ে দাঁড়াতে পারো তোমার সেই পরিচয় নিয়ে। আজ তাঁর চরম দুঃখের দিনে।

হীরকের অভাব, হীরকের দুঃখ, হীরকের বেদনার ভার একমাত্র তুমিই তাঁর মুছে দিতে পারো।

আর পারো সেই অভাগিনী কাঞ্চনাকে আজ তার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে।

তাই আমার ইচ্ছা, তুমি ফিরে যাও আজ আবার তোমার সত্যিকারের ঘরে, তোমার সত্য পরিচয় নিয়ে।

কাঞ্চনা ও হীরকের যে নিরপরাধ সন্তানটি আছে, তাকে তুমি বাঁচতে দাও। আর পার তো আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি আশীর্বাদক—
কালীপ্রসন্ন রায়।

॥ আট ॥

খাতাটা আগাগোড়া পড়া শেষ হয়ে গেল সুনন্দর।

খাতাটা হাতে ধরেই মুহ্যমানের মতো বসে রইল সুনন্দ।

এই তার ইতিহাস! এক ক্রিমিন্যাল বাপের রক্ত তার শরীরে! দুর্দান্ত ক্রিমিন্যাল জেল-পলাতক হীরক চৌধুরী তারই সহোদর ভাই!

সুনন্দ রায় সে নয়, সে সুনন্দ চৌধুরী!

সোফা ছেড়ে উঠে অস্থির পায়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সুনন্দ।

আবার বুঝি মনে হয়, কি প্রয়োজন ছিল তার আজকের এই পরিচয়ের?

কালীপ্রসন্নর সন্তান-পরিচয়েই যদি তার বাকি জীবনটা কেটে যেতো, কারো তো কোন ক্ষতিই ছিল না।

দুটো দিন দুটো রাত যেন পাগলের মতোই সুনন্দ ছটপট করে বেড়ালো।

কি করবে? এখন সে কি করবে, কি তার কর্তব্য?

চিরদিন জ্ঞান হওয়া অবধি যা সত্য বলে মেনে এসেছে, যা ধর্ম ও ন্যায় বলে জেনে এসেছে, সেই পথেই সে এগিয়ে যাবে, না, কালীপ্রসন্নর নির্দেশমত আজ সে গিয়ে মহাশ্বেতার পাশেই দাঁড়াবে? তার মা-র পাশে গিয়ে দাঁড়াবে?

মা! তার মা!

অবচেতন মনের সবটা জুড়ে আজো যাঁর স্মৃতি জলজল করছে।

দশ মাস দশ দিন যিনি গর্ভের সুধারসে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, সেই মা! তারপর চার বছর পর্যন্ত যিনি বুকের সুধা দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছেন, সেই মা-র কাছেই ফিরে যাবে, না, যেখানে আজ সে আছে সেখানেই সে থাকবে?

একদিকে সমাজ, আইন, সমস্ত মানুষের প্রতি তার কর্তব্য—অন্যদিকে তার গর্ভধারিণী—আর তারই সহোদর ভাই।

কে আজ সত্য? কোন্ সত্যকে সে আজ জীবনে বেছে নেবে?

তিন দিন পরে থানায় গিয়ে হাজির হলো হাঁটতে হাঁটতে সুনন্দ।

থানা-অফিসার রতীশ লাহিড়ী সানন্দে তাকে আহ্বান জানালেন, আসুন—আসুন, মিঃ রায়। আপনি বাইরে যান নি?

না।

চেয়ারে বসতে বসতে সুনন্দ শুধায়, তারপর এদিককার খবর কি বলুন। সে লোকটার কোন সন্ধান কিছু পাওয়া গেল?

কে বলুন তো?

বলছিলাম সেই মঙ্গলের কথা।

ক্ষেপেছেন, মিঃ রায়! আর তার পাত্তা পাওয়া যাবে আপনি মনে করেছেন! নেহাৎ একটা অঘটন ঘটে গিয়েছিল সেবার। বড় সাহেব তো শুনছিলাম বলছিলেন, আপনি ছুটি থেকে ফিরে এলে—

কথাটা শেষ হয় না লাহিড়ীর, হঠাৎ ঐ সময় সুনন্দর নজরে পড়লো—দেওয়ালে লটকানো মঙ্গলের একটা ছবির উপরে।

সরকারী দপ্তর থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। জীবিত বা মৃত মঙ্গলকে ধরে দিতে পারলে ঐ পুরস্কার সে পাবে।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল সুনন্দ ছবিটার দিকে।

চমকে ওঠে যেন লাহিড়ীর কথায় সুনন্দ। বলে, য্যাঁ, কি বললেন?

কি দেখছেন? পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তাই? মৃদু হেসে কথাটা বললেন লাহিড়ী এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন একটা ব্যঙ্গের সুরই প্রকাশ পায়—ঐ পুরস্কার-ঘোষণা পর্যন্তই। ওকে আর ধরতে হচ্ছে না।

আমি উঠি, মিঃ লাহিড়ী।

উঠে দাঁড়াল সুনন্দ।

এখুনি উঠবেন?

হ্যাঁ, চলি, একটু কাজ আছে।

থানা থেকে বের হয়ে আসে সুনন্দ।

সত্যি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সুনন্দ।

বিচিত্র একটা হাহাকার, একটা বেদনা যেন অনুভব করছিল সুনন্দ। অথচ সেটা যেন স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট।

থানা থেকে বাড়িতে ফিরে এসে দুটো দিন নিজের বসবার ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিল সুনন্দ।

কি করবে সে? চাকরিতেই আবার জয়েন করবে, না, শ্রীরামপুরে মা-র কাছে গিয়ে পরিচয় দেবে তার?

মহাশ্বেতার পরিচয়টা পাওয়ার পর থেকেই একটা অদৃশ্য আকর্ষণ যেন কেবলই টানছিল সুনন্দর মনকে শ্রীরামপুরের দিকে।

তার মা! যে মাকে এতদিন সে কেবল স্বপ্নেই দেখেছে।

ধরা দিয়েও যে তাকে ধরা দেয় নি, যে শুধু এতকাল স্বপ্নই ছিল, আজ যখন সেই স্বপ্নই সত্য হয়ে গেল, মনটা যেন এক অন্ধ আবেগে সেইদিকেই বারবার ছুটে যেতে চাইছে।

তবু আরো দুদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল সুনন্দ।

হীরকের কথা জানার পর সেখানে হয়তো যাওয়া তার উচিত হবে না। মা যদি তাকে অন্যরকম ভাবেন?

কিন্তু আবার মনে হয়, সে যদি আজ গিয়ে তার পরিচয়টা দেয়। বলে, জেনেছি তুমি আমারই মা!

কিন্তু তারপর?

যে সন্তান হয়তো আজ তাঁর স্মৃতি থেকেই মুছে গিয়েছে, সে সন্তানের জন্য কি আজ আবার সেই দীর্ঘ এত বছর আগেকার ভুলে যাওয়া মমতা দিয়ে তাকে তিনি বুকে তুলে নিতে পারবেন?

শুধু তো তাই নয়, আজ একটা বিচিত্র সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাঁর দুই সন্তানকে ঘিরে। যার ফলে যে সন্তানকে এতকাল তিনি বুকে করে রেখেছেন সেই হয়তো আজ সত্য তাঁর কাছে, আর সে হয়তো আজ মিথ্যা।

তার চাইতে এই ভাল। অপরিচয়ের মধ্যেই অজ্ঞাত, অখ্যাত সে থেকে যাক।

কিন্তু তবু—তবু প্রলোভনকে সুনন্দ যেন কিছুতেই জয় করতে পারে না।

দুর্নিবার এক আকর্ষণকে এড়াতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যার দিকে শ্রীরামপুরের দিকে রওনা হয়।

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে সুনন্দ এসে দাঁড়াল মৃগাঙ্কমোহনের শ্রীরামপুরের বাড়ির লোহার গেটটার সামনে।

গেটটা টানা। গেটের একপাশে দরোয়ানের ঘর।

বৃদ্ধ দরোয়ান যুধা সিং সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে।

জায়গাটা শহরের একেবারে গঙ্গার ধারে বলে একটু নির্জনই। বিশেষ করে ঐ সময় আরো নির্জন মনে হয়। নীচের তলায় কোন আলোর চিহ্ন নেই, কিন্তু দোতলায় আলো জ্বলছে দেখা যায়।

ঐ যে-সব ঘরে আলো জ্বলছে, তারই হয়তো কোন ঘরে তার মা আছেন।

পলাতক আসামী—ফেরারী মঙ্গল, হীরক চৌধুরীর বাড়ি।

কিন্তু পুলিস এখনো হীরক চৌধুরীর সত্যিকারের পরিচয়টাই পায় নি।

তাদের কল্পনাতেও আসবে না জেল-পলাতক ফেরারী আসামী মঙ্গলের সত্য পরিচয়, সে হীরক চৌধুরী।

মৃগাঙ্কমোহন ও মহাশ্বেতার সন্তান সে।

কিন্তু এখানে সে কেন এলো?

লোভীর মতো নিজের সত্যকারের পরিচয়টাই দিতে কি মহাশ্বেতার কাছে?

বলতে এসেছে কি সে, মা, আমিও তোমার একটি ছেলে?

কিন্তু কেন?

শোনা যায় মায়েরা নাকি কোনদিনই তাঁদের সন্তানকে চিনে নিতে ভুল করেন না—তা সে বছর ছেড়ে এক যুগ পার হলেও, তাই যদি সত্য তবে মা তো কই তাঁর নিজের সন্তানকে দেখেও চিনতে পারেন নি সে রাত্রে?

তবে? তবে কেন এসেছে সে এখানে এই মণিমঞ্জিলে?

ভাই হয়ে ভাইকে ধরে জেলে পুরেছিল—সেই কথাটাই কি আজ সে বলতে এসেছে তার মাকে?

মা যদি ঘৃণায় অবিশ্বাসে আজ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন?

না, না—সে শরিচয় সে দেবে না।

সে ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায়, সেই পরিচয়ই তার থাক।

কিন্তু তারপর?

সরকার কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে মঙ্গল ওরফে হীরক চৌধুরীর পরিচয়টা না জানলেও মহাশ্বেতা জানেন, সে সরকারের লোক। মহাশ্বেতা যদি তার সঙ্গে না দেখা করেন?

সে এসেছে শুনে অন্য কিছু সন্দেহ করে মুখের উপরেই তার যদি এ বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেন?

তবে কি সুনন্দ ফিরে যাবে ?

হ্যাঁ, সুনন্দ, ফিরেই যাও।

কি পরিচয়ে তুমি আজ এ বাড়িতে ঢুকতে চাও, কোন অধিকারে ?

কোন দাবিতে ? অবাঞ্ছিত তুমি।

মহাশ্বেতার কাছে আজ তুমি শুধু একান্ত অপরিচিতই নয়—অবাঞ্ছিত শত্রু।

কৌন হ্যায়—হঠাৎ দরোয়ানের কণ্ঠস্বরে যেন চমকে ওঠে সুনন্দ।—কৌন হো, কেয়া মাংতা, কিস্‌কো মাংতা ?

মাইজীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই দারোয়ানজী।

লেকিন ইস বকত তো উনোনে কিসিকো সাথ মুলাকাত নেই করতে হে বাবুজী।

ও হাম জানতা হায়। লেকিন বহুৎ জরুরী কাম হায়। দো মিনিটকে লিয়ে দরশন মিলে তো—

দরোয়ান যেন কি ভাবল। তারপর গেট খুলে আহ্বান জানাল, আচ্ছা আইয়ে।

কাঁকর বিছানো রাস্তা ধরে দুজনে গাড়ি-বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

গাড়ি-বারান্দায় উঠে দরোয়ান ডাকে, এ মধু—এ মধু ভাই !

মধ্যবয়সী ভৃত্য মধু বাইরে এসে বলে, কি হলো আবার ?

এই বাবুজী রাণীমাকো দর্শন মাংতা হায়।

কে আপনি ? মধু প্রশ্নটা করে তাকাল সুনন্দর দিকে।

তুমি আমাকে চিনবে না। তোমাদের রাণীমার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

মা তো এখন পুজোর ঘরে রয়েছেন।

আমি না হয় অপেক্ষা করব।

বেশ। আসুন তবে।

বাইরের ঘরের দরজা খুলে মধু সুনন্দকে বসতে দিল।

মাকে কি বলবো, কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

লক্ষ্ণৌ থেকে। মিথ্যাই বলে সুনন্দ।

মধু চলে গেল।

॥ নয় ॥

বিরাট বৈঠকখানা।

একদিকে বিস্তৃত ফরাস বিছানা। অন্যদিকে সোফাসেটটিতে সাজানো।

দেওয়ালে সব সেকালের চিত্রকরদের দামী দামী মূল্যবান অয়েল-পেন্টি, মাথার উপরে দোদুল্যমান ঝাড় ও সেই সঙ্গে আধুনিক বিদ্যুৎ-বাতি ও পাখা।

সব কিছুতেই একটা ঐশ্বর্যের ছাপ যেন সুস্পষ্ট।

ঘরটি নিয়মিত ব্যবহৃত না হলেও পরিষ্কার ছিমছাম। কোথাও একটু ধুলো নেই।

তৃষিত দৃষ্টিতে যেন চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সুনন্দ। এই তার নিজের গৃহ। এই গৃহেই তার মা রয়েছেন।

অথচ ভাগ্যের কি আজ রূঢ় পরিহাস! মহাশ্বেতার সন্তান হয়েও আজ তাকে অপরিচিতের মতো এসে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁর সামনে!

এই তার পৈতৃক ভিটে!

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে যদি আজ সে না ছিটকে দূরে সরে যেতো, এখানেই সে মানুষ হতো হয়তো!

মা জীবিতা থেকেও জ্ঞান হওয়া অবধি মায়ের স্নেহ থেকে, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলো, নিজের বাড়ি-ঘর আত্মীয় আপন জন থেকে সে দূরে সরে রইলো—সেই দুঃখটাই যেন ঐ মুহূর্তে সুনন্দর বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠতে থাকে।

ইতিমধ্যে যে কখন একসময় মধু এসে ঘরে প্রবেশ করেছে সুনন্দ টেরও পায়নি।

হঠাৎ মধুর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে।

বাবু!

কে!

বাবু! রাণীমা আসছেন—মধু বলে।

আসছেন? আগ্রহে, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দ।

হ্যাঁ, আসুন পাশের ঘরে।

মধুর সঙ্গে ঐ ঘর থেকে মধ্যবর্তী দরজা-পথে পাশের আর একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল সুনন্দ।

এ ঘরটি আকারে ছোট হলেও আগের ঘরটার মতই ছিমছাম ও সাজানো।

ঘরের মধ্যে গোটাদুই আলমারি। বইতে ঠাসা।

বসুন। রাণীমা এখনি আসছেন।

মধু বসতে বলে চলে গেল।

বসতে গিয়ে হঠাৎ দেওয়ালে টাঙানো একটি এনলার্জড্ ফটোর উপরে নজর পড়লো সুনন্দর।

ফটোর উপরে ওর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে যায়।

ফটোর মধ্যে মহাশ্বেতাকে চিনতে কষ্ট হয় না সুনন্দর।

যৌবনে মহাশ্বেতা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বছর দুয়েকের একটি ছেলে, আর কোলে আর একটি শিশু।

কে? কারা ওরা মহাশ্বেতার পাশে আর ক্রোড়ে? নিশ্চয়ই তারা দুই ভাই। হীরক আর সে।

মা, মাগো—ঐ যাকে পরম স্নেহে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, ভুলে গেছ কি একেবারেই আজ সেই হতভাগ্যের কথা?

একবারও কি মনে পড়ে না মা—দীর্ঘ তেইশ বছর আগে নৌকাডুবি হয়ে জলে যে সন্তানটি ডুবে গিয়েছিল তোমার সেই হতভাগ্য সন্তানটির কথা?

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

কে? মৃদু নারীকণ্ঠে সম্বোধন শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় সুনন্দ।

একি! তুমি!

সদ্য পূজা শেষ করে গরদের থান-পরিহিতা মহাশ্বেতা ঘরে এসে ঢুকেছেন।

বৈকালে বোধহয় স্নান করেছেন, ভিজা চুলের গোছা গুণ্ঠনের একপাশ দিয়ে বক্ষের উপরে নেমে এসেছে।

বাক্যহারা হয়ে যায় যেন সুনন্দ কয়েকটা মুহূর্তের জন্য।

অবরুদ্ধ একটা কামনা যেন তাকে প্রাণপণে সামনের দিকে ঠেলতে থাকে, নিজেকে লুটিয়ে দিতে চায় যেন ঐ দুটি পায়ে।

প্রাণভরে যেন ডেকে উঠতে ইচ্ছা করে একটিবার—মা! মাগো—

কিন্তু এক পা-ও নড়তে পারে না, একটি শব্দও স্ফুরিত হয় না ওষ্ঠ হতে সুনন্দর।

শুধু চেয়ে থাকে নির্নিমেষে।

মহাশ্বেতা আবার বলেন, তুমি? তবে যে মধু বলছিল লক্ষ্ণৌ থেকে—

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম। পরিচয় দিতে চাই নি আমার আপনার চাকরের কাছে। মৃদুকণ্ঠে বলে সুনন্দ।

কিন্তু হঠাৎ যেন মহাশ্বেতার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায় হঠাৎ এসময় এখানে কেন?

তবে কি, তবে কি সে পলাতক হীরকের আবার কোন সন্ধান পেল।

মুখখানা যেন তাঁর সহসা কেমন পাংশু বিবর্ণ হয়ে যায়।

সুনন্দ বোধকরি বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এবং ততক্ষণে সে নিজেকে সামলেও নিয়েছে।

মৃদুকণ্ঠে বলে, আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি। ভয়ের আপনার কোন কারণ নেই। সেজন্য আমি আসি নি—আমি এসেছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

কিন্তু মায়ের প্রাণ বিশ্বাস বুঝি করতে পারে না সুনন্দর কথা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিঃশব্দে মহাশ্বেতা সুনন্দর মুখের দিকে।

কি? কিজন্য তুমি এসেছ তাহলে? কি চাও তুমি?

বলছি, বলে একটু যেন থেমে আবার বলে, আচ্ছা ঐ যে দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো রয়েছে—ঐ,—ঐ ফটোটা আপনারই তো?

হ্যাঁ—

আর ঐ যে একজন দাঁড়িয়ে আপনার পাশে—আর একজন আপনার কোলে?

আমার দুই ছেলে। হীরক আর কোরক, মানে বাচ্চু।

ও। আপনার তাহলে দুই ছেলে?

হ্যাঁ—কিন্তু—আমার ছোট ছেলেটির যখন বছর চারেক বয়স—দুর্ঘটনায়—মানে নৌকাডুবি হয়ে, ওকে—কোরককে আমি হারাই।

জলে ডুবে মারা যায়?

হ্যাঁ—

ইচ্ছা হয় সুনন্দর সে চিৎকার করে বলে ওঠে, না, না, যা, তুমি যা জানো তা ভুল। মারা সে যায় নি। আজো, আজো সে বেঁচে আছে—এই যে তোমার সামনে সে দাঁড়িয়ে, মা। তোমার সামনেই সে দাঁড়িয়ে—

কিন্তু কিছুই বলতে পারে না, অন্তরের সেকথা অন্তরেই গুমরাতে থাকে আর বোবার মতো সে থাকে দাঁড়িয়ে।

মা আর ছেলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু কিজন্য এসেছিলে তা তো কই বললে না? প্রশ্ন করেন মহাশ্বেতা কিছুক্ষণ পরে আবার।

এ্যাঁ। চমকে ওঠে যেন সুনন্দ।

কই, বললে না তো—কেন তুমি এসেছ!

এতক্ষণ ভাবছিল সুনন্দ হঠাৎ এখানে আসবার সে কি কৈফিয়ৎ দেবে, এখন যেন একটা বলবার মত খুঁজে পায় সুনন্দ।

মৃদুকণ্ঠে সুনন্দ বলে, আমি, আমি এসেছিলাম ঐ কথাটিই জানতে—আপনার কয়টি সন্তান ছিল।

কেন? ওকথা জেনে তোমার কি হবে?

কিছু না, এমনিই—

মহাশ্বেতা অতঃপর ক্ষণকাল চুপ করে থাকেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেন, আমি জানি তুমি কেন এসেছো।

কেন?

ভয়ে ভয়ে তাকাল সুনন্দ মহাশ্বেতার মুখের দিকে।

মহাশ্বেতা এবারে স্পষ্টাস্পষ্টিই বলেন, সেই হতভাগাটার, মানে, ঐ হীরকের—কোন খবর কি পেয়েছ?

না।

সত্যি বলছ—কোন, কোন সংবাদই তার জান না?

সত্যিই বলছি জানি না। তাছাড়া আমি এখন ছুটিতে। অন্য লোকের 'পরে তার খোঁজবার ভার পড়েছে—আচ্ছা, আমি এখন তাহলে যাই?

একটু বোস তুমি। আমি আসছি—মহাশ্বেতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হায়রে হতভাগ্য, বুক-ভরা তৃষ্ণা নিয়ে কার কাছে তুই ছুটে এসেছিস!

মনের কোথায়ও তুই আজ আর ওর বেঁচে নেই।

অনেকদিন আগেই যে তুই ওর কাছে মৃত। সমস্ত স্নেহ আজ ওর সেই ফেরারী ছেলেকে ঘিরেই বুকের মধ্যে আবর্ত রচনা করছে। সেখানে তোর স্থান কোথায়?

তবে লোকে যে বলে যতকাল যতবছর পরেই মা ছেলেকে দেখুক না কেন, মায়ের ছেলেকে চিনতে এতটুকু দেরি হয় না! আপনা থেকেই সেই সন্তানের জন্য মায়ের বুকে সুধা ঝরে!

সব তবে গল্পকথা! সবই কল্পনা! কাব্য! কোন সত্য নেই তার মধ্যে!

একটু পরে প্লেটে কিছু মিষ্টি নিজের হাতেই নিয়ে মহাশ্বেতা এসে ঘরে ঢুকলেন।

একি! না, না—এ আমি এখন খেতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করুন—তাড়াতাড়ি বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সুনন্দ।

সে কি হয় সুনন্দ! এই আমার বাড়িতে তুমি প্রথম এলে, একটু মিষ্টিমুখ করো।

আর প্রতিবাদ জানাতে পারে না সুনন্দ। হাত বাড়িয়ে মা-র হাত থেকে-প্লেটটা নেয়।

কিন্তু মিষ্টি যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না সুনন্দর। গলায় আটকে যায়।

ঘরের বাইরে ঐ সময় পদশব্দ শোনা গেল এবং শোনা গেল মৃদু নারীকণ্ঠস্বর, মা !

এসো বৌমা, ভিতরে এসো।

যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো একটি বৌ এসে সলজ্জ কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো, সঙ্গে তার বছর পাঁচেকের একটি ছেলে।

সুনন্দ, এই আমার বৌমা।

হাত তুলে নমস্কার জানায় বধূটি। সুনন্দও প্রতিনমস্কার জানায়।

ঐ—ঐটি বুঝি আপনার নাতি ?

হ্যাঁ। বাবলু—

ইচ্ছা করে সুনন্দর ছেলেটিকে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেয়। তার দাদার ছেলে। কিন্তু কোথায় যেন একটা সংকোচ তাকে বাধা দেয়।

তবু দুহাত বাড়িয়ে দেয় সুনন্দ ছেলেটির দিকে, এসো—

না। বাবলু মায়ের আঁচল শক্ত করে ধরে দাঁড়ায়।

যাও, উনি ডাকছেন। বধূটি বলে।

বাবলু তবু বলে, না—

হঠাৎ মনে হয় সুনন্দর, একি করছে সে !

হীরক চৌধুরী ফেরারী আসামী। হীরক চৌধুরী ক্রিমিন্যাল। জীবিত বা মৃত তাকে ধরবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আর সে ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়।

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমি এবার যাই।

কোনমতে বিদায় নিয়ে সুনন্দ ঐ গৃহ থেকে বের হয়ে এলো।

হীরক চৌধুরী তার কে ? কেউ নয়।

কেউ নন হীরক চৌধুরীর মা ঐ মহাশ্বেতা দেবী তার।

কেউ নয় তার ঐ বধূটি। কেউ নয় তার ঐ ছেলেটি।

সে ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়। হীরক চৌধুরী পলাতক, ফেরারী। সে সরকারের কর্মচারী।

॥ দশ ॥

কেমন যেন মুহ্যমানের মতোই মণিমঞ্জিল থেকে বের হয়ে এলো সুনন্দ। এবং অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে শুরু করলো স্টেশনের দিকে। স্টেশনে এসে খবর নিয়ে জানল ফিরতি ট্রেন কলকাতার সেই রাত সাড়ে নয়টায়। মাঝখানে কোন আর ট্রেন

নেই। অনেকটা পথ হেঁটে পা-দুটো বেশ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। একটা বেঞ্চির পরে বসল।

পাশাপাশি মনের পাতায় তিনটি মুখ ভেসে ওঠে।

মহাশ্বেতা, কাঞ্চনা ও বাবলুর।

কেন গিয়েছিল সে ছুটে মণিমঞ্জিল! ওদের দেখতে কি! কিন্তু কেন!

পরিচয় সে তো দিতে পারবে না, জানতো সুনন্দ। তবু কেন গিয়েছিল।

কিন্তু পরিচয় দিলেই বা কি এসে যেতো!

সত্যিই তো, কেন চলে এলো বোকার মতো কোন কথা না বলে!

তবে কি আবার ফিরে যাবে মণিমঞ্জিলে!

গিয়ে সত্য পরিচয়টা তার দেবে!

না, না—তা হয় না।

আজ যদি কর্তৃপক্ষ জানতে পারে পলাতক আসামী হীরক চৌধুরী তারই সহোদর ভাই, তখন হয়তো তার উপরই এসে সন্দেহ পড়বে।

হয়তো ভাববে কর্তৃপক্ষ, সেই যোগসাজস করে হীরকের জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে—

তাছাড়া—হ্যাঁ—তাছাড়া—হীরকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সেই কি আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে কারো সামনে!

তার চাইতে এই ভাল।

কিন্তু মা—তার মা—

দূরে ট্রেনের সার্চলাইট দেখা গেল। কলকাতাগামী ট্রেনটা আসছে।

কলকাতায় ফিরে ক'টা দিন বাড়ি থেকে বেরই হলো না সুনন্দ। কিন্তু বাড়ি থেকে বের না হলে কি হবে, প্রত্যহ সে হেডকোয়ার্টারে সংবাদ নেয়—মঙ্গল, ফেরারী মঙ্গল, ধরা পড়ল কি না। তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি না।

কোন সংবাদ নেই মঙ্গলের আজ পর্যন্ত, এতটুকু সূত্রও খুঁজে বের করতে পারে নি তার পুলিস।

মনে মনে যেন একটা স্বস্তি অনুভব করে সুনন্দ।

নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজে ঘরের মধ্যে সোফায় পড়ে থাকে।

এমন সময় একদিন সংবাদ পেল সুনন্দ আগের দিন সন্ধ্যার দিকে দমদমার কাছাকাছি একটা বাগানবাড়িতে নাকি মঙ্গলের সন্ধান করতে করতে পুলিসের এস. আই. গিয়ে হাজির হয়েছিল দু-তিন জন পুলিস নিয়ে। মঙ্গলের সঙ্গে নাকি মুখো-

মুখিও হয়েছিল। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়। একটা খণ্ডযুদ্ধও হয়ে গিয়েছে। পুলিসের ধারণা মঙ্গল আহত হয়েছে গুলিতে, কারণ ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাগানবাড়িটার পিছনদিকে একটা ধান-ক্ষেত ও জলাভূমি ছিল, সেইদিক দিয়েই কেমন করে আহত হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গল নাকি গা ঢাকা দিয়েছে।

পুলিসের লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধান করেও কোন কিনারা করতে পারে নি।

মঙ্গল পুলিসের গুলিতে আহত।

আশ্চর্য। তবু সে পালিয়েছে। তার কোন সন্ধান করতে পাবে নি পুলিস।

কিন্তু আহত যখন হয়েছে মঙ্গল নিশ্চয়ই বেশিদূব পালাতে পাবে নি।

হয়তো আশেপাশেই কোথাও আহত অবস্থায় আত্মগোপন করে আছে।

আর পুলিস যেভাবে সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়তো ধরে ফেলবে এবার।

এবার হয়তো ধরা পড়বে মঙ্গল, হীরক চৌধুরী। এবং ধরা পড়লে তার যে চরম দণ্ডই দেবে বিচারকরা, কোন সন্দেহ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শান্ত সেই দেবী-প্রতিমার মতো বধূটির চেহারা চোখের 'পরে ভেসে ওঠে সুনন্দর। পরিধানে সাদা থান।

নিরাভরণা দুটি হাত। মাথায় সিঁদুরবিন্দু মুছে গিয়েছে।...দুহাতে সুনন্দ মুখ ঢাকে।

ও তো শুধু কোন-এক বাঙালী বধূই নয়—তার ভ্রাতৃজায়া।

চৌধুরীবংশের বধূ। এবং সেই চৌধুরীবংশের বক্তই তারও ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত।

যে রক্তকে সে অস্বীকার করতে চাইলেই করতে পারে না। পারবেও না।

সত্যিই কি করবে সুনন্দ কিছুই বুঝতে পারে না।

চেষ্টা করে বারবার জীবন থেকে যে অধ্যায়টা অতীতে একদিন মুছে গিয়েছে সে অধ্যায়টাকে আর না স্মরণ করবার।

কিন্তু পারে না।

বারবার মহাশ্বেতা তার সমস্ত মনটা জুড়ে এসে দাঁড়ায়। ছলছল চোখে যেন দুটি হাত পেতে এসে দাঁড়ায়।

কেমন করে ফিরিয়ে দেবে তাকে আজ সুনন্দ!

হীরক হয়তো অপরাধী কিন্তু মহাশ্বেতার অপরাধ কি ?

কাঞ্চনারই বা কি অপরাধ, আর কি অপরাধই বা তার ছেলে বাবলুর।

কোন্ বিচারে হীরকের অপরাধের বোঝা আজ তারা বইবে ?

আবার ঘুরেফিরে মনের পাতায় ভেসে ওঠে মঙ্গল—হীরক।

সেই জেল-পলাতক কয়েদী।

পারে না।

কিছুতেই মন থেকে হীরককে মুছে ফেলতে পারে না সুনন্দ।

এবং একদিন আবার বের হয়ে পড়ে সুনন্দ মঙ্গলেরই খোঁজে।

ঠিক যেমন করে একদিন, মঙ্গলের সত্যিকারের পরিচয়টা জানত না, তার খোঁজ করেছিল, তেমনি করেই আবার খোঁজ শুরু করে দেয় তার।

পুলিসের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত আজ—মঙ্গল আহত।

আহত মঙ্গলকে আজ নিশ্চয়ই সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে পড়ে একটি মেয়ের কথা সুনন্দর—রত্না।

কলকাতার সাধারণ একটি রঙ্গমঞ্চে রত্না নর্তকী, অভিনেত্রী রত্না।

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে ঐ রত্নার গৃহেই হানা দিয়ে প্রথম মঙ্গলকে সে চাক্ষুষ দেখেছিল।

কিন্তু প্রস্তুত ছিল না বলে সে রাত্রে মঙ্গলকে সে ধরতে পারে নি।

সেই সময়ই শুনেছিল সুনন্দ, রত্নার গৃহে মধ্যে মধ্যে আসে মঙ্গল। রত্নার সঙ্গে মঙ্গলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আজ রত্নার ওখানে আবার গেলে সহজেই তাকে দেখে চিনে ফেলবে, সে ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়।

সুনন্দ ছদ্মবেশ নিল, তারপর চলল এক রাত্রে রত্নার গৃহে।

রাত তখন এগারোটা।

রত্না সবে থিয়েটার থেকে ফিরে তার শয়নঘরে একটা কৌচের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ঝি এসে জানাল, একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রত্না বলে, আর দেখা করার সময় হলো না, এই রাত্রে ? যা, বলে দে, দেখা হবে না।

বলেছিলাম, কিন্তু দেখা না করে সে যাবে না।

রত্নার কথাটা শুনে কেমন যেন কৌতূহল হয়। বলে, পাশের ঘরে নিয়ে এসে বসা। আমি আসছি—

মিনিট দশেক বাদে রত্না এসে পাশের ঘরে ঢুকল।

সুনন্দ একপাশে দেওয়ালের একটা ছবি দেখছিল। পদশব্দে ফিরে তাকাল রত্নার দিকে।

পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশেও সুনন্দর সুশ্রী চেহারা রত্নাকে মুগ্ধ করে, মনে তার সম্ভ্রম জাগায়।

রত্না হিন্দীতেই নমস্কার জানিয়ে বলে, বৈঠিযে—

লাহোর আমার দেশ হলেও চিরদিন বাংলা মুলুকেই আমি মানুষ রত্নাদেবী। বাংলা ভাষা আমি বলতে পারি।

বসুন। রত্না আবার অনুরোধ জানায়।

দুজনে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসল।

আপনি হয়তো জানেন না রত্নাদেবী, আপনার অভিনয় ও নৃত্যের আমি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

রত্না মৃদু হাসে।

কিন্তু সবার আগে বোধহয় আপনার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম আপনাকে।

না, না—তাতে কি—

নিশ্চয়ই। থিয়েটার থেকে ফিরে আপনি হয়তো এখন ক্লান্ত—

তা হোক। কেন এসেছেন আপনি বলুন? নিশ্চয়ই এত রাত্রে আলাপ করতে আসেন নি আমার সঙ্গে—

মেয়েটি যে বুদ্ধিমতী—জানতো সুনন্দ। প্রথম দর্শনের সময় সামান্যক্ষণের আলাপ-পরিচয় থেকেই সুনন্দ সেদিন বুঝতে পেরেছিল মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

তাছাড়া সেদিনকার ভদ্র ও সংযত ব্যবহারেও রত্নার প্রতি যেন শ্রদ্ধাই জেগেছিল।

তাই সোজাসুজিই তার বক্তব্য সে শুরু করে।

মৃদু হেসে বলে, না। ঠিকই ধরেছেন আপনি রত্নাদেবী। আমার দীর্ঘদিনের একটি বন্ধুর খোঁজ করছিলাম—

বন্ধু!

হ্যাঁ। প্রেমচাঁদ সিংহ। শুনেছিলাম আপনার সঙ্গে তার পরিচয় আছে।

ও নাম তো আমি কখনো শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না!

ওটা অবিশ্যি তার আসল ও সত্যিকারের নাম নয়।

সত্যিকারের নামটা তাহলে কি?

যমুনাপ্রসাদ।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে ওঠে রত্না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুনন্দর মুখের দিকে তাকায়।

ভয় পাবেন না রত্নাদেবী? আমি পুলিসের লোক নই। আমার নাম সুন্দর সিং।

কিন্তু আমি তো যে নাম এই মাত্র বললেন সে নামে কাউকে জানি না।

আপনি দেখছি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বাস করতে পারেন আমাকে, আমার দিক থেকে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

তারপরই একটু হেসে বলে, শুনুন রত্নাদেবী, সে আমার বিশেষ বন্ধু। কিছু-দিনের জন্য আমি কলকাতায় ছিলাম না। হঠাৎ তার একটা চিঠি পাই—বিশেষ কারণে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং চিঠিতে জানিয়েছে তার সন্ধান নাকি আপনার কাছে এলেই আমি পাবো।

কিন্তু—

আপনি যদি জানেন সে কোথায়, বললে আমি বাধিত হবো।

আমি তো আপনাকে বললাম, তাকে আমি চিনি না।

চেনেন না?

না।

ও নামটাও আপনি কোনদিন শোনেন নি রত্নাদেবী?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রশ্নটা করে তাকিয়ে থাকে সুনন্দ রত্নার মুখের দিকে।

দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে রত্না আবার বলে, না।

মুহূর্তকাল অতঃপর সুনন্দ স্থিরদৃষ্টিতে রত্নার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে।

তারপর শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলে, শুনুন, রত্নাদেবী, আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি নি। ভাল করে জেনেশুনেই এখানে এসেছি—

কিন্তু—

আমি জানি তাকে আপনি চেনেন তো বটেই এবং স্নেহও করেন।

না। তাকে আমি চিনি না। আপনার যদি অন্য কোন কথা না থাকে তো —আমি এবার উঠবো। আমি সত্যিই অত্যন্ত ক্লান্ত। বলতে বলতে সত্যিসত্যিই রত্না উঠে দাঁড়ায়।

বুঝতে পারছি রত্নাদেবী, আপনি আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কেন আপনি একই কথা বারবার বলছেন? বললাম তো, তাকে চেনা তো দূরে থাক—ও নামটা পর্যন্ত কখনো আগে আমি শুনি নি। তাছাড়া সত্যিই আমি ক্লান্ত। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

আচ্ছা, নমস্কার রত্নাদেবী। সুনন্দ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে সুনন্দর জুতোর শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল। ঝি যে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তাও শোনা গেল।

রত্না যেন সত্যিই এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। এবং অনেকটা উত্তেজনার পর বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পাশেই যে সোফাটা ছিল সেটার উপরে বসে পড়ল।

যমুনাপ্রসাদ?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বুকটার মধ্যে ধ্বক করে উঠেছিল রত্নার।

সে রাত্রির কথাটা কোনদিন বুঝি ভুলতে পারবে না রত্না। প্রথম যেদিন অ্যাসিড-বাল্ব্-এ পুড়ে পুলিসের ভয়ে পলাতক যমুনাপ্রসাদ মঙ্গল পরিচয়ে মধ্যরাত্রে তার ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল, রত্না আজও তা জানে না।

চোখে ঘুম আসছিল না বলে একাকী ঘরের মধ্যে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রত্না।

হঠাৎ মৃদু একটা পদশব্দ কানে যেতেই ফিরে তাকিয়েছিল এবং তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা ভয়ার্ত শব্দ যেন তার অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক হাত বাড়িয়ে ওর মুখটা চেপে ধরে চাপা সতর্ক কণ্ঠে বলে উঠেছিল, চুপ, চেঁচিও না—

বলতে বলতে আগন্তুক মুখ থেকে আলোয়ানের গুণ্ঠনটা সরাতেই লোকটার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখটা ওর চোখে পড়েছিল।

সমস্ত মুখখানা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কেবল দুটো চোখ খোলা।

সাপের চোখের মতই সে চোখের দৃষ্টি যেন ওর অন্তর পর্যন্ত ভেদ করছিল।

কে! কে তুমি?

আমি যমুনাপ্রসাদ।

না, না—তুমি যাও। যাও এখান থেকে—করুণ মিনতি জানিয়েছিল রত্না।

ভাল করে চেয়ে দেখ তো রত্না, সত্যিই কি আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?

না, না—আমি তোমাকে চিনি না। চিনি না—

রত্না, আমি সত্যিই যমুনাপ্রসাদ, যদিও এখন আমার নাম সকলে জানে মঙ্গল।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল রত্না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে করে চেয়ে ছিল ওর মুখের দিকে।

মঙ্গল!

হ্যাঁ।

তুমি—তুমি আজো বেঁচে আছ?

হ্যাঁ! আজো আমি বেঁচে আছি—পুড়ে আমি মরি নি—

এরকম কি করে হলো?

অ্যাসিড বাল্‌ব্‌-এ পুড়ে—কিন্তু যমুনাপ্রসাদ মরেছে। এবং মরে যমুনাপ্রসাদ মঙ্গল হয়েছে।

॥ এগারো ॥

পাথরের মতোই যেন সুন্দর সিং ঘর থেকে চলে যাবার পর সোফাটার 'পরে বসে ছিল রত্না।

রত্না!

কে! চমকে উঠে দাঁড়ায় রত্না সোফাটা ছেড়ে।

আমি। এবারেও কি চিনতে কষ্ট হচ্ছে নাকি আমাকে রত্না?

ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল যমুনাপ্রসাদ বা মঙ্গল—

ডান পা-টা টেনে একটু যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতেই একটা লাঠির উপরে ভর দিয়ে দিয়ে যমুনাপ্রসাদ এসে একটা চেয়ারের উপর বসল।

লাঠিটা একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখল।

পরিধানে একটা কালো লংস্‌, গায়ে অনুরূপ একটি কোট। একমুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। চোখে কালো চশমা। চোখ থেকে চশমাটা খুলল যমুনাপ্রসাদ।

ঐ লোকটা কেন এসেছিল রত্না? যমুনাপ্রসাদ এবারে প্রশ্ন করে রত্নার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

কে?

একটু আগে তোমার ঘর থেকে যে বের হয়ে গেল।

তোমারই খোঁজ করতে। বলেছিল, তোমার বন্ধু নাকি ও।

বন্ধু! হ্যাঁ—বন্ধুই বটে।

সুন্দর সিং তোমার বন্ধু নয়?

ও সুন্দর সিং নয় রত্না।

কে তবে? রত্নার কণ্ঠে বিস্ময়।

ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়।

সেকি! চমকে ওঠে রত্না সত্যিসত্যিই এবারে।

তাই। তারপর একটু থেমে বলে, ও তাহলে মাঝেমাঝে এখানে আসে?

না তো!

আবার মিথ্যে কথা! গর্জে ওঠে যমুনাপ্রসাদ।

সত্যি বলছি। এই প্রথম—

তবে রে হারামজাদী! আজ তোকে গলা টিপেই শেষ করে ফেলবো—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ডান পা-টা চেপে ধরে যমুনাপ্রসাদ!

কি হলো? ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে রত্না একটু যেন।

হাড়টা বোধহয় ভেঙেছে, উগুটাও বোধহয় সেপ্‌টিক্ হয়েছে—যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে কোনমতে কথাগুলো বলে যমুনাপ্রসাদ পায়ে হাতটা বুলাতে থাকে।

রত্না চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

কি ভাবছ রত্না, পাঁচ হাজার টাকার কথা, তাই না? হঠাৎ বলে যমুনাপ্রসাদ।

পাঁচ হাজার টাকা?

হ্যাঁ, আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই টাকাটা পেয়ে যাবে। শোবার ঘরে তো তোমার ফোন রয়েছে, কেবল একটা ফোন করে দিলেই—কি? করবে নাকি ফোন?

রত্না কোন জবাব দেয় না। চেয়ে থাকে যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে।

সেবারে হীরালাল ছিল, সোজা আমাকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্ণৌতে তুলেছিল, কিন্তু হীরালালটা মরে গিয়ে এবারে আমাকে সত্যিই বিপাকে ফেলেছে। কিন্তু কই, বললে না তো—সুনন্দ রায় আরও কতদিন এখানে এসেছে?

বিশ্বাস না করলে কি করবো? আজই প্রথম—

বিশ্বাস! নর্তকীকে বিশ্বাস, অভিনেত্রীকে বিশ্বাস! যাক্ ওকথা, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। ভেবেছিলাম এখানেই ক'টা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো, কিন্তু এখানেও ওর নজর পড়েছে যখন আবার ও হানা দেবে এখানে, শ্রীরামপুরেও যাওয়া হবে না। চন্দননগরে তোমার একটা বাড়ি আছে না?

হ্যাঁ—

সেখানে কয়দিন গিয়ে থাকবো। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—

আমি যাবো! কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে তাকায় রত্না যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

কিন্তু—

কি?

কি পরিচয় দেবে আমার লোকের কাছে?

পরিচয়? পরিচয় দেবো, তুমি আমার স্ত্রী।

তোমার স্ত্রী—

হ্যাঁ—পা-টার একটা ব্যবস্থা না করলে চলছে না। সেখানে বসে চিকিৎসা করিয়ে পা-টা সারিয়ে তুলতে হবে। আজ রাত্রেই যাবার ব্যবস্থা করো।

এত রাত্রে—

তোমার দরোয়ান নাথু সিং আছে তো—তাকে দিয়ে ব্রীজলালের ট্যাক্সিটা ডেকে আনাও—এই কাছেই এগারো নম্বর বস্তিতে ব্রীজলাল থাকে। যাও—আর দেরি করো না—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও—

রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সুনন্দ।

কোথায় তাহলে যেতে পারে হীরক! আহত অবস্থায় নিশ্চয়ই সে বেশিদূর কোথাও যেতে পারে নি। এবং আহত অবস্থায় যেখানেই সে যাক, সেখানে বিশ্বাস না থাকলে হীরক নিশ্চয়ই পা দেবে না।

তাছাড়া তার নিজের দলেও হয়তো তার শত্রু আছে।

কাজেই দলের সকলকেও সে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে না।

রত্নার কাছে হয়তো সত্যিই সে আসে নি। তাছাড়া আহত অবস্থায় হয়তো কলকাতায় ফিরে আসতে তার এখন সাহস হবে না।

তবে কোথায় সে যেতে পারে?

শ্রীরামপুরে।

কথাটা একবার মনে হয় সুনন্দর। শ্রীরামপুরে কাঞ্চনার কাছে কি যেতে পারে না হীরক?

কাঞ্চনার আশ্রয়ের মতো নিরাপদ জায়গা আজ আর তার কোথায়! সত্যি, একথাটা তো একবারও তার মনে হয় নি। পুলিস যখন এখনো তার আসল পরিচয়টাই জানে না, তার শ্রীরামপুরের বাড়ির কথাটা চিন্তাও করতে পারবে না।

শ্রীরামপুরে তার নিজের গৃহই আজ তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়।

বাকী জীবনটা সে যদি তার সেখানেই গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, কেউ হয়তো যমুনাপ্রসাদ বা মঙ্গলকে আর খুঁজেই পাবে না।

সবাই জানে মহাশ্বেতার একমাত্র ছেলে হীরক চৌধুরী সংসার ত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত হীরক চৌধুরীর কোন সংবাদই নেই।

আরো একটা কথা, যমুনাপ্রসাদ বা মঙ্গলের নামে পুলিসের অভিযোগ থাকলেও হীরক চৌধুরীর বিরুদ্ধে পুলিসের খাতায় কোন রিপোর্ট লেখা নেই।

কাজেই পরবর্তীকালে হীরক চৌধুরীই যে যমুনাপ্রসাদে এবং তারপর মঙ্গলে পরিবর্তিত হয়েছে, আজো পুলিস নিশ্চয়ই তা জানতে পারে নি।

জেনেছে কথাটা একমাত্র সে-ই আজ।

অ্যাসিড বাল্‌ব্‌-এ পুড়ে আহত হয়ে লক্ষ্ণৌতে পালাবার পূর্বে আমীরুল্লার সহকারী হিসাবে পুলিসের সঙ্গে তার যে সংঘর্ষ হয়, সে সময়ও পুলিস তার সত্যকারের পরিচয়টা পায় নি।

সবাই জানে দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল যমুনাপ্রসাদই আহত হয়েছিল।

আহত হয়েছিল যে হীরক চৌধুরীই তা এখনো পুলিস জানতে পারে নি।

পরে মঙ্গল পরিচয়ে যখন আবার সে আবির্ভূত হলো, তখন সবাই ভেবেছিল ওর আসল নামটা বুঝি যমুনাপ্রসাদই। এবং ঐ যমুনাপ্রসাদই পরে মঙ্গল নাম নিয়েছিল।

হীরক চৌধুরীর তাতে করে অবিশ্যি সুবিধাই হয়েছে। হীরক চৌধুরীর 'পরে এখনো কারো সন্দেহই পড়ে নি।

কিন্তু মুখটা অ্যাসিড বাল্‌ব্‌-এ পুড়ে যাওয়ায় এবং তার সেই চেহারার ফটো পুলিসের দপ্তরে থাকায় আজ হীরক চৌধুরীরও গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মহাশ্বেতা এবং কাঞ্চনা জানলেও বাড়ির দাস-দাসীরা আর তো কেউ জানে না সত্যি ব্যাপারটা। সেদিক দিয়েও বিপদের সম্ভাবনা ভেবেই হয়তো হীরক চৌধুরী নিজের ঘরে আর ফিরতে সাহস পায় নি এতদিন।

কিন্তু এখন? এখন যে সে অনন্যোপায়!

নিশ্চিন্ত বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয় যে আহত হীরকের এখন চাই-ই একটা। আর সে আশ্রয় একমাত্র তার নিজের গৃহেই।

সুনন্দ মনে মনে স্থির করে শ্রীরামপুরের বাড়ির আশেপাশেই সে নজর রাখবে।

কালই সে শ্রীরামপুরে চলে যাবে।

মধ্যরাত্রে ব্রীজলালের ট্যাক্সিটা এসে সরু গলির মুখে দাঁড়াল।

ব্রীজলাল অবিশ্যি আপত্তি জানায় নি ট্যাক্সি নিয়ে আসতে অত রাত্রেও। কারণ, প্রথমতঃ মঙ্গল ছাড়া যে এত রাত্রে কেউ তাকে ডাকবে না সে যেমন জানত, তেমনি জানত মঙ্গলের নির্দেশ না পালন করলে তার আক্রোশ থেকে কোন নিষ্কৃতির পথই তার নেই।

একটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে রত্নার পিছনে পিছনে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসল কোনমতে যমুনাপ্রসাদ।

গাড়ীতে স্টার্ট দেবার আগে চাপাকণ্ঠে ব্রীজলাল শুধায়, কোন্ দিকে?

ট্রাংক রোড—বালীব্রীজ দিয়ে যাও।

কথাটা অবিশ্যি রত্নাই বলে মঙ্গলের পূর্বনির্দেশমত।...ব্রীজলাল গাড়ি ছেড়ে দিল।

॥ বারো ॥

সে রাত্রে সুনন্দ বিদায়ের পর মহাশ্বেতা যখন অন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছেন পিছন থেকে কাঞ্চনা মৃদুকণ্ঠে ডাকে, মা।

কি, বৌমা? ঘুরে দাঁড়ালেন মহাশ্বেতা।

উনি কি সন্দেহ করেছেন?

কি?

বলছিলাম আপনার ছেলের কথা।

আমারও তাই মনে হয়, মা। কথাটা আমাদের কাছে ও ভাঙল না বটে, তবে আর কি কারণই বা থাকতে পারে ওর এখানে আসবার এভাবে হঠাৎ!

তারপর একটু থেমে মহাশ্বেতা বললেন, থাক গে বৌমা, ওকথা ভেবে আর কি হবে! আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই—হতভাগাটাকেও একদিন ধরা পড়তেই হবে।

আপনাকে একটা কথা আমি ক'দিন থেকেই বলবো বলবো ভাবছিলাম, মা। মৃদুকণ্ঠে কাঞ্চনা কথাগুলো বলে।

কি, বৌমা?

আমি একটা চাকরি নিয়েছি মা।

চাকরি! বিস্ময়ে কথাটা বলে মহাশ্বেতা পুত্রবধূর দিকে তাকান।

হ্যাঁ, মা। ডিহরি-অন-শোনের একটা স্কুলে। এ ছাড়া আর আমার যে অন্য কোন পথই নেই, মা। বাবলুকে বাঁচাতে হলে—

কথাটা বুঝতে অবশ্যই মহাশ্বেতার দেরি হয় না।

কাঞ্চনা যে কেন চাকরি নিয়েছে বুঝতে তিনি পারেন বৈকি। কিন্তু তবু কয়েকটা মুহূর্ত যেন কোন কথাই তিনি বলতে পারেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কাঞ্চনাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘরে এসে ঝি প্রবেশ করলো, দাদাবাবু, চল, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।

কাঞ্চনা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, খেতে যাও বাবলু।

ঝি-র সঙ্গে বাবলু চলে গেল।

তাহলে তুমি বৌমা—এবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই ঠিক করলে? অনেকক্ষণ পরে যেন কথাগুলো মহাশ্বেতার মুখ থেকে বেরুল।

তাছাড়া আমার নিজের লজ্জা আর বাবলুর লজ্জাকে এড়াবার কোন আর পথ আছে বলুন? আমি এই ক'বছর অনেক ভেবেছি, মা। কিন্তু কোন পথই খুঁজে পাই নি।

বলবার তো কিছুই নেই মা আমার। মৃদুকণ্ঠে বললেন মহাশ্বেতা, যাকে গর্ভে ধরেছি—সেই যখন মুখে আমার চুন-কালি মাখিয়ে দিল অমন করে—কাকে আর কি বলবো! বলবার কিছু নেই—কিন্তু আমি, আমি—কি করে এই শূন্যপুরীতে একা-একা থাকব তা বলতে পার?

এর কি জবাব দেবে কাঞ্চনা, আর কি জবাবই বা দিতে পারে, তাই মাথাটা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

বেশ, যাও—সবাই তোমরা চলে যাও। কথাটা বলতে বলতে মহাশ্বেতা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অশ্রুতে দুচোখের দৃষ্টি তখন তাঁর ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সোজা এসে দোতলায় নিজের শয়নঘরে প্রবেশ করলেন। এবং ঘরে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ে দেওয়ালে টাঙানে স্বামীর অয়েল-পেন্টিংটার উপরে।

পায়ে পায়ে মহাশ্বেতা স্বামীর ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পারলাম না, পারলাম না। তোমার বংশকে তোমাদের পাপ থেকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। পাপের দণ্ড আমাদের নিতেই হবে, নিতেই হবে।

সত্যি কাঞ্চনা নিজের সঙ্গে এই কয়বছর অনেক সংগ্রাম করেছে।

যে মুহূর্তে তার স্বামীর সত্যিকারের ভয়াবহ রূপটা তার সামনে প্রকাশ পেয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকেই যেন কাঞ্চনার মৃত্যু হয়েছিল।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে কাঞ্চনা। আই. এ. পাস করার পর হঠাৎ হীরকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। মহাশ্বেতা তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরের কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের লেখাপড়া—জানা মেয়েটি।

মহাশ্বেতা কাঞ্চনাকে দেখামাত্রই পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করেন। একটি পয়সাও যৌতুক দিতে পারেন নি কাঞ্চনার বাবা হরিশঙ্করবাবু। দেবার অবিশ্যি ক্ষমতাও ছিল না তাঁর।

মহাশ্বেতাও অবিশ্যি একমাত্র কাঞ্চনাকে ছাড়া অন্য কোন দাবিই জানান নি।

বিবাহের কিছুকাল আগে থাকতেই হীরকের চরিত্রে তার বাপ মৃগাঙ্কমোহনের দুষ্কৃতি ও পাপ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মহাশ্বেতা সেটা তখনও জানতে পারেন নি।

জানলে যে তিনি কাঞ্চনার মত নিরপরাধিনী একটি মেয়ের নারী হয়ে অতবড় সর্বনাশটা করতেন না, সুনিশ্চিত।

তিনি প্রথম ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন বাবলু, হীরকের পুত্র, জন্মাবার কিছু আগে।

সন্তান-সম্ভাবিতা কাঞ্চনা তখন পিতৃগৃহে অবস্থান করছে। এবং আকস্মিক-ভাবেই একরাত্রে ব্যাপারটা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

কলকাতার ঝাউতলার বাড়িতে কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে গিয়ে হীরককে না পেয়ে আমীরুল্লা এসেছিল হীরকের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীরামপুরেই এক গভীর রাত্রে। এবং সেইদিনই মহাশ্বেতা প্রথম জানতে পারেন হীরক এক ছদ্মনাম নিয়ে আমীরুল্লার দলে ভিড়েছে এবং সে ছদ্মনামটা তার হচ্ছে যমুনাপ্রসাদ।

আমীরুল্লাও শ্রীরামপুরে মৃগাঙ্কমোহনের মণিমঞ্জিলে যমুনাপ্রসাদের খোঁজে গিয়ে যেমন বুঝতে পারে নি সেটা মৃগাঙ্কমোহনেরই গৃহ তেমনি বুঝতে পারে নি যার খোঁজে সেদিন সে মণিমঞ্জিলে গিয়ে হাজির হয়েছিল সেই যমুনাপ্রসাদ আসলে মৃগাঙ্ক-মোহনেরই সন্তান। এবং তার আসল নাম যমুনাপ্রসাদ নয়—হীরক।

কিন্তু মহাশ্বেতা অতদিন পরেও আমীরুল্লাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, তাই তাকে বিদায় করে দিয়েছিলেন মিথ্যা বলে।

মহাশ্বেতার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল আমিরুল্লাকে হীরকের খোঁজে আসতে দেখে কারণ আমীরুল্লাকে যে মহাশ্বেতা চিনতেন।

স্বামীর কাছে আমীরুল্লাকে আসতে তিনি অনেকবার দেখেছেন তাঁদের কলকাতার ঝাউতলার বাড়িতে। এবং মৃত্যুসময় অনুতপ্ত মৃগাঙ্কমোহন স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন আমীরুল্লাই তাঁর জীবনের শনি।

আমীরুল্লা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাশ্বেতা এসে ছেলের ঘরে ঢুকলেন।

হীরক! ঐ লোকটা তোমার কাছে এসেছিল কেন?

কে? কার কথা বলছ, মা?

ঐ আমীরুল্লা খান।

ও, খান সাহেব! তুমি বোধহয় জান না, মা, ও মস্তবড় একজন টিম্বার-মার্চেন্ট। ওর সঙ্গে আমার একটা বিজনেসের কথাবার্তা চলছে—

কতদিন থেকে ওর সঙ্গে তোমার পরিচয়?

তা, বছর দুই তো হবেই।

কোথায় পরিচয় হলো?

এবারে হীরক যেন একটু থতমত খেয়ে যায়। যেখানে খানের সঙ্গে হীরকের পরিচয় সেকথা আর যাকেই বলা যাক, মাকে বলা চলে না।

ঐ মানে—পরিচয় হয়েছিল—আমতা আমতা করে হীরক।

কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মহাশ্বেতা।

ব্যাপারটা বুঝতে আর তাঁর দেরি হয় না।

কিন্তু তবু তিনি স্পষ্ট করে ছেলেকে সেদিন কিছু বলেন নি।

বলতে পারেন নি।

কেবল বলেছিলেন, তুমি যে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে যাবে বলেছিলে, তার কি হলো?

ব্যারিস্টারীতে আর পয়সা কি মা! ভাবছি বিজনেসই করবো।

কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত চলে যাও। তাছাড়া তোমার যে ব্যাঙ্কে টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তি আছে তোমার বিজনেস না করলেও টাকার অভাব হবে না। তারপর একটু থেমে বলেন, বেশ তো, ব্যারিস্টারী না পড়তে চাও, বিলেতে গিয়ে আরো লেখাপড়া করে এসো।

না, মা, বিলেত আমি যাবো না। আমি ব্যবসা করবো ঠিক করেছি।

বেশ। ব্যবসাই যদি করতে হয় তো তোমার বাবার যে কাঠের ব্যবসা ছিল সেই ব্যবসাই করো।

ও কাঠের ব্যবসায় আর কটা টাকা লাভ, মা! অন্য ব্যবসা করছি আমি।

শোন হীরক, যে ব্যবসাই তুমি করো—আমীরুল্লার সঙ্গে নয়।

মা!

হ্যাঁ আমীরুল্লার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকে আমার ইচ্ছা নয়।

কিন্তু মা—লোকটা—

লোকটা কি আমি জানি। একটা কথা তোমার জানা দরকার—তোমার বাপের অনেক দুঃখের ও অকালমৃত্যুর কারণ ঐ লোকটাই—

কি বলছ মা তুমি!

তুমি সন্তান, এর বেশি আর তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তবে যা বললাম, সেই মতো কাজ করলেই আমি খুশি হব জেনো।

কিন্তু আমাদের সব ব্যবস্থা যে পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে—কথা দিয়েছি আমি—

তবু যা বললাম তাই তোমাকে করতে হবে।

না, মা, তা আজ আর সম্ভব নয়।

হীরক! তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকলেন মহাশ্বেতা।

বললাম তো। তাছাড়া ভাল-মন্দ বুঝবার বয়সও আমার হয়েছে। কথাটা বলে হীরক ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মহাশ্বেতা এগিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন, হীরক, শোন বাবা, আমি তোর মা। আমি বলছি—জীবনে ওর মতো শত্রু তোর আর নেই।

শত্রু হোক, মিত্র হোক, ওকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না।

আমি তোর মা। আমার জন্যেও পারবি না?

হীরক আর মায়ের কথার কোন জবাব দেয় নি। ঘর থেকে কেবল বের হয়ে গিয়েছিল।

নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মহাশ্বেতা একাকী ঘরের মধ্যে।

অনেকদিন পরে আবার তার দুচোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

স্বামীকেও ফেরাতে পারেন নি সেদিন মহাশ্বেতা ঐ আমীরুল্লার গ্রাস থেকে।

স্বামীও তাঁকে সেদিন ঠিক ঐ একই জবাব দিয়েছিলেন।

স্বামীর পথরোধ করেও দাঁড়িয়েছিলেন মহাশ্বেতা।

বলেছিলেন, না। তোমাকে আমি যেতে দেবো না। কিছুতেই না।

পথ ছাড়ো মহাশ্বেতা। মৃগাঙ্কমোহন বলেছিলেন।

না, না, ঐ শয়তানের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক তোমাকে রাখতে দেবো না—

মহাশ্বেতা, ঘরের বৌ তুমি—চৌকাঠের বাইরে পা দেবার চেষ্টা করো না—

হ্যাঁ, বৌ—ঘরের বৌ। কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী। চেয়ে দেখো আমার মুখের দিকে। আমার জন্যও কি তুমি ওকে ত্যাগ করতে পার না?

না।

স্বামী মৃগাঙ্কমোহনও সেদিন তাঁর কথা শোনেন নি, ছেলে হীরকও শুনলো না।

নিরুপায় মহাশ্বেতা তখন সব কথা পত্রে লিখে কাঞ্চনাকে জানালেন।

কাঞ্চনা যেদিন শাশুড়ীর পত্রটা পেল সেইদিনই রাত্রে তার বাবলু জন্মায়।

পনেরো দিনের ছেলেকে বুকে নিয়ে কাঞ্চনা শ্বশুরগৃহে ছুটে এলো বাবা ও ভাইদের শত নিষেধ অগ্রাহ্য করেও।

পৌত্রকে বুকে তুলে নিয়ে মহাশ্বেতা কেঁদে ফেললেন, এসেছিস মা? আমি পারলাম না—তুই দেখ মা, যদি তুই হীরককে ফেরাতে পারিস।

সে কোথায় মা?

আজ দুদিন বাড়িতে নেই, কলকাতায় গিয়েছে—

আমি যাই সেখানে?

তাই যা মা। কালই চলে যা। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কিন্তু পরের দিন আর যাওয়া হলো না কাঞ্চনার।

ঐ রাত্রেই দুঃসংবাদটা জানা গেল।

॥ তেরো ॥

গভীর রাত্রে মহাশ্বেতা সবে পুজো শেষ করে শয়ন করতে যাবেন বলে ঘরের বাইরে এসে পা দিয়েছেন, অদূরে বারান্দায় আবছা আলোছায়ায় একটা ছায়ামূর্তি দেখে চমকে উঠলেন।

কে? কে ওখানে?

মা আমি, হীরক—

সর্বাঙ্গে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে হীরক দাঁড়িয়ে।

হীরক, এত রাত্রে—কখন এলি? মহাশ্বেতা এসে দাঁড়ান ছেলের সামনে।

হীরক যেন প্রায় নিঃশব্দকণ্ঠে বলে, ভীষণ বিপদ মা। পুলিস—পুলিস আমাকে চারিদিকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, যদিও তারা আমার সত্যি পরিচয়টা জানে না এখনো—

পুলিস অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে তোকে—

হ্যাঁ, মা—বলতে বলতে মুখ থেকে চাদরটা সরাল হীরক।

সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ।

সভয়ে আঁতকে ওঠেন মহাশ্বেতা, একি, মুখে তোর ব্যাণ্ডেজ কেন হীরক?

আস্তে মা। চেঁচিও না। অ্যাসিডে পুড়ে গেছে—

পুড়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ—একটা দুর্ঘটনায়। প্রাচীর টপকে চোরের মতো এসে ঢুকেছি বাড়িতে। সব বলবো তোমাকে আমি মা। ঘায়ের বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। একটা রাত ঘুমাতে পারি নি, পেটে একটা দানা পড়ে নি, গঙ্গার ধারে একটা নৌকার আড়ালে আত্মগোপন করেছিলাম। কিছু আছে মা খাবার? কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় হীরক নিজের ঘরের দিকে।

মুহূর্তে যেন পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবীটা টলে উঠেছিল মহাশ্বেতার।

অ্যাসিড বাল্‌ব্‌-এ মুখ পুড়ে যাওয়ায় অত রাত্রে সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হীরকের চোরের মত আসা! পিছনে পুলিসের অনুসরণ।

কথাগুলো অসংলগ্ন হলেও তার মধ্যে কোথায় যেন একটা অর্থ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে মহাশ্বেতার কাছে একটুও দেরি হয় নি। এবং মনের মধ্যে যে আশংকাটা এতদিন তাঁকে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত করে রেখেছে এবং আমীরুল্লার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িতে দুদিন আগে একরাত্রে যে আশংকাটা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল সেটা যে মিথ্যা নয়,—নিষ্ঠুর সত্য—সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একেবারে পাথর হয়ে যান।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে মহাশ্বেতা যেন তাঁর সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠেন।

সমস্ত মুখখানা তাঁর কঠিন হয়ে ওঠে।

দাঁড়াও। কঠিন শোনাল মহাশ্বেতার কণ্ঠস্বর।

একটু যেন চমকেই দাঁড়ায় হীরক।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

আমার ঘরে।

না। ও ঘরে বৌমা আছে—

কাঞ্চনা, কাঞ্চনা—ফিরে এসেছে নাকি?

হ্যাঁ। আজই সে চলে এসেছে আমার চিঠি পেয়ে। সব কথাই তাকে আমি তোমার সম্পর্কে জানিয়েছিলাম।

কি? কি তুমি জানিয়েছ তাকে?

তোমার বাপের রক্তের পাপ যে তোমাকেও গ্রাস করেছে সেই কথাই তাকে জানিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে যদি তোমাকে ফেরাতে পারে, কিন্তু এখন বুঝলাম তোমার নিষ্কৃতি নেই। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

হীরক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বাধা দেন মহাশ্বেতা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? এবাড়িতে আর নয়—

মা!

হ্যাঁ, চোরের মত আত্মগোপন করে যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও। যদি কোনদিন মুখের তোমার ঐ পোড়া দাগ তুলতে পারো তো এ বাড়িতে এসো—নচেৎ জেনো এ বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরদিনের মতোই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মা!

একটা আর্ত ডাক যেন হীরকের অস্ফুট কণ্ঠ হতে বের হয়ে আসে।

না, না—আমি তোমার মা নই। আজ থেকে জানবো আমার দুটি সন্তানের একটিও আর বেঁচে নেই। আজ থেকে জানবো—

কিন্তু মুখর কথাটা শেষ করতে পারলেন না মহাশ্বেতা, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো অল্প দূরে পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পুত্রবধূ কাঞ্চনা।

ইতিমধ্যে কখন যে কাঞ্চনা এসে ঐখানে দাঁড়িয়েছে দুজনের একজনও ওরা টের পায় নি

মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলেন মহাশ্বেতা। তারপরই সেখান থেকে চলে গেলেন।

মার গমনপথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার হীরক তাকাল তার স্ত্রীর মুখের দিকে।

কাঞ্চনা!

কাঞ্চনা নিরুত্তর।

কাঞ্চনা, তুমিও কি—

কাঞ্চনা কোন জবাব দেয় না। ঘুরে সোজা গিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরের অর্গল তুলে দেয়।

অতঃপর মাথা নীচু করেই হীরক সিঁড়ি দিয়ে সে রাত্রে নেমে গিয়েছিল।

শয়নকক্ষের খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহাশ্বেতা।

নিজের পুত্র হলেও ক্ষমা করেন নি সেদিন থেকে মহাশ্বেতা।

ক্ষমা তো করেনই নি, এমন কি মা হয়ে ক্ষুধার্ত আহত সন্তানকে তিনি সে রাত্রে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। আর সে ফিরে আসে নি।

কিন্তু কই, তবু তো সে অপরাধী সন্তানকে আজো তিনি ভুলতে পারেন নি!

এই কয় বছর প্রতি দিন, প্রতি রাত্রে সেই গৃহহারা ছন্নছাড়া অপরাধী পুত্রের জন্যই নিভৃতে অশ্রুবর্ষণ করেছেন আর আজও করছেন।

আহারের গ্রাস মুখে তুলতে গেলেই সেই বিতাড়িত ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখখানিই মনে পড়েছে। পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে হাহাকারে বুকটা ভরে গিয়েছে।

এবং সে ধরা পড়েছে জেনে স্থির থাকতে পারেন নি। ছুটে গিয়েছিলেন এক রাত্রে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়ের কাছে।

মুখে তিনি যাই বলুন, সেই অপরাধী সন্তানেরই মুক্তির গোপন আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কি সে রাত্রে তিনি ছুটে যান—নি ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়ের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে?

এই আশঙ্কাতেই কি ছুটে যান নি পাছে সেই পুত্রের সমস্ত কলঙ্ক বিচারালয় থেকে সমস্ত জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়?

শত অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও গোপনে চোখের জলে এই প্রার্থনাই কি ঠাকুরের কাছে বারবার জানান নি, সে যেন ধরা পড়ে?

কাঞ্চনাও ভাবছিল সেই রাত্রে।

হ্যাঁ, এই কয় বছর নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রামই করেছে সে।

পরিচিত ও আত্মীয়স্বজনেরা যদিও জানত কাঞ্চনার স্বামী গৃহত্যাগ করেছে, সত্য কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনার দাদা ও বাবার কাছে বেশিদিন গোপন থাকে নি।

তারা জেনেছিল আসলে কেন কাঞ্চনার স্বামী গৃহত্যাগ করেছে।

তারাও জেনেছিল কাঞ্চনার স্বামী আজ ফেরারী আসামী।

কাঞ্চনার তাই পিতৃগৃহেও স্বামীর কলঙ্কের দাগ সর্বাঙ্গে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার কোন পথ ছিল না।

সে দরজাও তার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বুঝি চিরদিনের মতোই।

তাছাড়া ঐ অসহায় শিশুকে বুকে করে নিয়ে কোথায়ই বা যাবে কাঞ্চনা।

তাই বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ দুঃসহ এক জ্বালা নিয়ে মহাশ্বেতার কাছেই এতদিন পড়েছিল। তবু একটা সান্ত্বনা ছিল তার, তারা জানলেও বাইরের আর দশজন তার স্বামীর কলঙ্কের কথাটা জানে না আজও।

কিন্তু স্বামী ধরা পড়েছে যেদিন সে শুনলো, বুকটার মধ্যে যেন কেঁপে ওঠে কাঞ্চনার।

এবার আর দুনিয়াসুদ্ধ কারো জানতে বাকী থাকবে না তার স্বামীর কীর্তি-কাহিনী। আভিজাত্যের মুখোশটা এবার তাদের সবারই মুখ থেকে খসে পড়বে।

চৌধুরী-বাড়ির মণিমঞ্জিলের সমস্ত আভিজাত্য আর গৌরব, সমস্ত গর্ব আর সম্মান একটা ফেরারী আসামীকে কেন্দ্র করে আদালতের কাঠগড়া থেকে সংবাদ-পত্রের দৌলতে দুনিয়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

চৌধুরী-বাড়ি তো যাবেই—সেই সঙ্গে সে-ও কালীর ছিটায় কালো হয়ে উঠবে, তার সন্তান বাবলু—তার সমস্ত ভবিষ্যৎ ও কালো হয়ে যাবে। তার সন্তানের সমস্ত সম্ভাবনাকে গ্রাস করবে তারই জন্মদাতার কলঙ্ক আর পাপ।

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কাঞ্চনা ছটফট করতে থাকে। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠতে থাকে।

কি করবে! কি করবে এখন কাঞ্চনা!

যে কয়দিন হাজতে ছিল হীরক, ছটফট করেছে কেবল কাঞ্চনা।

এমন সময় অকস্মাৎই এলো আবার জেল থেকে ফেরারী হবার সংবাদ হীরকের।

হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছিল কাঞ্চনা। এবং সেই সময়ই তার মনে হয়—আর না। আর বুঝি এখানে পড়ে থাকা নিরাপদ নয়।

স্বামী তার আবার ধরা পড়বার আগেই এই চৌধুরী-বাড়ি থেকে তার বাবলুকে নিয়ে সরে যেতে হবে, দূরে, অনেক দূরে, যেমন করেই হোক বাবলুকে তাকে বাঁচাতেই হবে।...কয়েকটা দিন কেবল কাঞ্চনা ভেবেছে আর ভেবেছে। কিন্তু কোন পথই খুঁজে পায় নি।

অবশেষে হঠাৎ মনে হয়েছে চাকরি নিয়েই তো সে কোথায়ও তার বাবলুকে নিয়ে সরে যেতে পারে।

কিন্তু মনে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আবার মহাশ্বেতা কি সম্মত হবেন?

পরক্ষণেই সম্মত কেনই বা হবেন না? কিন্তু সম্মত তাঁকে হতেই হবে।

চাকরি খুঁজতে শুরু করে কাঞ্চনা। দরখাস্তর পর দরখাস্ত পাঠাতে থাকে এখানে ওখানে।

অবশেষে ডিহরি-অন-শোনের বালিকা বিদ্যালয়ে একটা চাকরি পেয়ে গেল। দিন দুই হলো নিয়োগপত্র এসেছে।

সেই চাকরির কথাই বলছিল কাঞ্চনা মহাশ্বেতাকে। এবং ভেবেছিল মহাশ্বেতা বাধা দিলেও সে শুনবে না।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অস্বীকার করবার বুঝি সত্যিই তার ক্ষমতা নেই।

সে দুর্ভাগিনী নিঃসন্দেহে। কিন্তু মহাশ্বেতা কি তারই মতো দুর্ভাগিনী নয়।

মহাশ্বেতাও তো তারই মতো এই বাড়িরই বধূ।

কি পেয়েছে সে?

কি পেলেন তিনি? শুধু লজ্জা আর অপমান। নিয়তি। নিয়তিই তাকে এই বাড়িতে টেনে এনেছে।

মহাশ্বেতার মতোই তাকেও জ্বলে-পুড়েই মরতে হবে সারাটা জীবন।

এ বাড়ির বধূদের বুঝি এই ভাগ্যলিপি।

।। চোদ্দ ।।

ভোররাত্রের দিকে হীরক এসে রত্নার চন্দননগরের বাড়িতে পৌঁছাল।

বাড়িটা রত্নারই এক মাসীর বাড়ি।

মাসীর কোন সন্তানাদি না থাকায় তার মৃত্যুর পর রত্নাই বাড়িটা পেয়েছিল।

শহরের একেবারে এক টেরে নির্জনে গঙ্গার ধারে বলে বাড়িটায় ভাড়াটে বড় একটা আসতো না। বেশির ভাগ সময়ই খালিই পড়ে থাকতো বাড়িটা। ঐ সময়ও খালিই পড়ে ছিল।

বছরে এক-আধবার রত্না এসে বাড়িটায় থেকে যেতো।

একটা বুড়ো উড়ে মালী ছিল, সে-ই বাড়িটা দেখাশোনা করতো।

মধ্যে মধ্যে এসে বাড়িটায় দুচার দিন রত্না থাকতো বলে কিছু আসবাব ও তৈজসপত্র বাড়িতে ছিল।

ওদের সাড়া পেয়ে বুড়ো মালী এসে ভোর রাত্রে যেন একটু অবাক হয়েই দরজাটা খুলে দেয়।

মা, হঠাৎ? মালী জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ মালী, এলাম—কিছুদিন থাকবো।

মালী ঘরের দরজা খুলে দিল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে রত্নার উপরে ভর দিয়ে ভিতরে এসে প্রবেশ করল হীরক ঘরে।

একটা চেয়ারের উপর গা ঢেলে দিতে দিতে আরামসূচক একটা শব্দ করে বলে হীরক, আঃ, এইবার আমি নিশ্চিন্ত রত্না।

রত্না কিন্তু কোন কথাই বলে না।

হীরক আবার বলে, পায়ের যন্ত্রণাটা আর সহ্য করতে পারছি না রত্না। এখানে আশেপাশে কোন ডাক্তার আছে জানা রত্না?

আছে।

কতদূর? তাকে একবার ডেকে আনা যায় না?

যাবো? ডেকে আনবো গিয়ে?

কেন, তোমার মালীকে পাঠাও না।

না, আমিই যাই।

তোমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে নাকি?

তা একটু আছে বৈকি। তবে সে অনেকদিন আগে ছিল। মাসীর অসুখের সময় যখন এখানে ছিলাম।

ঠিক আছে, আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তুমি যাও সেই ডাক্তারকেই পাওয়া যায় কিনা একবার না হয় দেখো।

রত্না চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে। হঠাৎ আবার পিছন থেকে ডাকল হীরক, রত্না?

কি?

তোমার আসতে কতক্ষণ লাগবে?

তা কুড়ি-পঁচিশ মিনিট তো লাগবেই—

অতক্ষণ—আমি একা থাকবো এখানে?

হীরকের কথায় যেন একটু বিস্মিত হয়েই তাকায় রত্না ওর দিকে।

হীরকের কথাটা যেন ঠিক ও বুঝতে পারে না।

রত্না, তুমি, তুমি—আমাকে এখানে ফেলে একা একা চলে যাবে না তো?

ক্ষণকাল স্তব্ধদৃষ্টিতে হীরকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর মৃদু স্মিতকণ্ঠে বললে, না—তাছাড়া মালী তো রইলো।

আচ্ছা, তুমি যাও—

আধঘণ্টা বাদেই স্থানীয় প্রৌঢ় আশু ডাক্তারকে সঙ্গে করে ফিরে এলো রত্না।

উৎকণ্ঠিত হীরক বাইরের বারান্দায় কান পেতেই ছিল, ওদের জুতোর শব্দে ও কথোপকথনের শব্দে বুঝতে পারে ওরা আসছে।

পুরুষকণ্ঠ শোনা যায়, কোন্ ঘরে আপনার স্বামী?

এই যে আসুন, এই ঘরে—

প্রৌঢ় আশু ডাক্তারকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল রত্না।

মাথার সমস্ত চুলই বলতে গেলে পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। একজোড়া বেশ সযত্নরক্ষিত কাঁচাপাকা গোঁফ। চোখে পুরু লেন্স্-এর কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা। পরিধানে সাদা খদ্দরের ট্রাউজার ও অনুরূপ গলাবন্ধ কোট।

খাটের পরে শুয়ে খাটের বাজুর উপরে ব্যাণ্ডেজ-বাধা পা-টা তুলে শুয়ে ছিল হীরক। চোখে-মুখে যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

ঘরের চারপাশে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শয্যায় শায়িত হীরকের দিকে তাকালেন আশু ডাক্তার।

যে কোট ও লংস্ পরে হীরক এসেছিল, সেগুলো পরেই শুয়ে আছে হীরক।

ঘরের মধ্যেও একটা অনেক দিনের বদ্ধ বাতাস ও ধুলো-ধুলো গন্ধ। খাটের পরে হীরক শুয়ে আছে, তাতে গদি ছাড়া কোন শয্যামাত্রও নাই।

এখানে আমরা ছিলাম না ডাক্তারবাবু—রত্না বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কথাটা বলে, একটু আগে এখানে এসে পৌঁচেছি। কোনো কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারি নি, এসেই আপনার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

আশু ডাক্তার আর বিশেষ কোন কথা বলেন না।

রোগীকে পরীক্ষা করবার জন্যই বোধহয় এবারে এগিয়ে গেলেন খাটের দিকে। এবং বসবার কোন জায়গা না থাকায় খাটের পরেই উপবেশন করলেন।

রত্না তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে একটা টুল নিয়ে এলো, আপনি এটার 'পরে বসে ওকে পরীক্ষা করুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার সে কথার কোন কান দিলেন না, হীরকের পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ক্ষত পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন ততক্ষণে গভীর মনোযোগে।

এ তো দেখছি উণ্ড সেপটিক হয়ে গিয়েছে—ইমিডিয়েট অপারেশনের প্রয়োজন।

অপারেশন! অস্ফুট শব্দটা যেন হীরকের কণ্ঠ নিয়ে বের হয়ে এলো।

তাছাড়া কোন উপায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

শুধু ইনজেকশনে হয় না ডাক্তারবাবু?

না।

ফ্র্যাকচারও কি হয়েছে?

মনে হচ্ছে—

তবে কি পা-টাই বাদ দিয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু?

এতক্ষণ ভাল করে বেশ হীরকের মুখের দিকেই তাকান নি আশু ডাক্তার।

এবারে ওর মুখের দিকেই সোজাসুজি তাকালেন।

ভয় পাচ্ছেন কেন মিঃ রায়? যা করবার আমি করবো। কিন্তু আপনাকে আমার ডাক্তারখানায় যেতে হবে—

রত্না আশু ডাক্তারের কাছে হীরকের পরিচয় দিয়েছিল তার নাম দেবব্রত রায় বলে।

তাই আশু ডাক্তার হীরককে মিঃ রায় বলেই সম্বোধন করেন।

না, না—আমি কোথায়ও যেতে পারবো না, যা করবার আপনি এখানেই করুন ডাক্তারবাবু—ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠে হীরক।

তাহলে আমার সব ঔষধ যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে হয় ডাক্তারখানায় গিয়ে—

যা দরকার আপনার সব নিয়ে আসুন ডাক্তারবাবু, এখান থেকে আমি কোথায়ও যেতে পারবো না। আর যা করবার এখুনি করুন, এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

আশু ডাক্তার বললেন, ব্যস্ত হবেন না, মিঃ রায়, ব্যবস্থা আমি করছি।

কম্পাউণ্ড ফ্রাকচার ছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পরিশ্রমের পর আশু ডাক্তার অপারেশন শেষ করে হীরকের পায়ে প্লাসটার করে দিলেন।

আশু ডাক্তার অবিশ্যি কোনরকম সন্দেহ করেন নি, কিন্তু তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট সর্বক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখছিল হীরকের মুখের পোড়া দাগটা।

তবে সৌভাগ্য, তার চোখে পড়েনি তখনো মঙ্গলের ফটো দিয়ে সংবাদপত্রের যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল—সেই সংবাদটা।

আশু ডাক্তার বিদায় নিলেন যখন, হীরক তখনো ঔষধের প্রভাবে গাঢ় নিদ্রাভিভূত।

রত্না স্তব্ধ হয়ে হীরকের শিয়রের ধারে বসে রইলো।

তার অভিনেত্রী ও নর্তকী জীবনে অনেকেই তার কাছে যাতায়াত করেছে।

কখনো কেউ এক রাত্রি বা দুই রাত্রি, আবার কেউ কেউ তার বেশি। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে রত্নার। কিন্তু কেউ কোনদিন দাগ কাটে নি কোন তার মনে।

পুরুষ যে কেন তাদের কাছে আসে এবং কিসের আকর্ষণে আসে রত্নার সেটা অজানা ছিল না।

তবে তাদের মধ্যে বিশেষ দু-এক জনকে যে মধ্যে মধ্যে ভাল লাগে নি রত্নার তা ও নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু যমুনাপ্রসাদ যেদিন প্রথম তার ঘরে আসে রত্নারই একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে, তার বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষোচিত চেহারাটা যেন সঙ্গে সঙ্গে রত্নার মনকে আকৃষ্ট করেছিল।

মনে হয়েছিল কেন যেন রত্নার যারা তার কাছে আসে এ সে দলের নয়।

এ তাদের থেকে পৃথক।

হীরকের বন্ধু হীরালালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, আমার বন্ধু যমুনাপ্রসাদ। এদিককার লোক নয়, তবে বাংলা তোমার আমার মতোই বলতে পারে। একেবারে বাজা ব্যক্তি—

রত্না বলেছিল, বসুন—

হীরক একটু দূরেই বসেছিল।

দু'চারটে মামুলী কথার পর হীরালাল বিদায় নিয়েছিল।

হীরক তখনো তেমনি দূরেই বসে।

রত্না বলে, নেমে এসে ভাল করে বসুন না ফরাসে!

কেন বল তো! হীরক ভ্রু তুলে তাকায়, এখানে বসলেও তোমার প্রাপ্য তুমি পাবে।

কি কথার জবাবে কি কথা! তবু বলেছিল রত্না, ওখানে বসতে হয়ত আপনার কষ্ট হচ্ছে—

মোটেই না—বরং তোমাদের মতো মেয়েদের পাশে বসলেই গিয়ে কষ্ট হবে।

অতঃপর ঐ কথার যে কি জবাব দেওয়া যেতে পারে রত্না ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

তাই মাথা নীচু করে ছিল।

শোন—

হীরকের ডাকে আবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল রত্না।

কি নাম তোমার?

রত্না।

হীরালাল তোমাকে আমার কথা আগে বলে নি?

না তো!

Idiot! আমি তো বলেইছিলাম তাকে কেন এখানে আসতে চাই—যাক্,

সে যখন বলে নি আমিই বলছি। তোমার এখানে এসে আমি মাঝেমাঝে রাত কাটাতে চাই—

রাত কাটাতে চান? কথাটা যেন ঠিক রত্নার বোধগম্য হয় না।

হ্যাঁ,—সে জন্য অবিশ্যি তুমি যা চাও পাবে।

কিন্তু—

কেন, অসুবিধা আছে নাকি কিছু?

না—অসুবিধা আর কি?

বেশ। তবে ঘুমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও তো। বড্ড ঘুম পেয়েছে—

ঘুমাবেন!

হ্যাঁ—হ্যাঁ, তবে কি সারারাত বসে বসে তোমার সঙ্গে প্রেমের কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলব নাকি!

অতঃপর উঠে পড়েছিল রত্না।

তারপর থেকে প্রায়ই এসেছে হীরক রাত কাটাবার জন্য রত্নার ঘরে।

অর্থাৎ নিশ্চিন্তে রাতটা ঘুমাতে এসেছে হীরক।

রত্নাও ব্যবস্থা করে দিয়েছে হীরককে রাত কাটাবার তার গৃহে।

উদ্ধত দাম্ভিক পুরুষ হীরক। অথচ আশ্চর্য! প্রথম দিনই যেন তার সেই দম্ভ রত্নার মনের মধ্যে হীরক সম্পর্কে একটা অদ্ভুত নেশা জাগিয়েছিল।

হীরকের প্রয়োজন যা হীরক তা বরাবর জোর করে ছিনিয়েই নিয়েছে।

তাছাড়া হীরকের রত্নার দেহের প্রতি কোনদিন কোন আকর্ষণই প্রকাশ পায় নি।

সে ব্যাপারটা রত্নার কাছে আরো বিচিত্র ও আরো অদ্ভুত লেগেছিল পরবর্তী-কালে। এমন কি হীরক কখনো তার গায়ে হাত দিয়েছে বলেও রত্নার মনে পড়ে না।

হীরক যখনই তার গৃহে আসতো এবং যতক্ষণ থাকতো, রত্না যেন একপ্রকার ভয়ে কেমন সিঁটিয়ে থাকতো।

কেমন যেন একটা ভয়ে সর্বক্ষণ তার বুকের ভিতরটা ছম ছম করতো।

একদিন সাহস করেই রত্না শুধিয়েছিল, যমুনাপ্রসাদ, তুমি এখানে আস কেন?

হীরকের আসল নামটা রত্না জানতো না। যমুনাপ্রসাদ ও পরে মঙ্গল নামেই তাকে জানতো।

কেন আসি?

হুঁ।

ও কথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

কারণ সবাই এখানে যে কারণে আসে—

কথাটা শেষ করতে পারে নি রত্না, যমুনাপ্রসাদ বলেছিল, জানি। কিন্তু আমার সে প্রয়োজন নেই—তোর এখানে বেশ নিরাপদ নিরিবিলি—তাই—

তাই আসো?

তাছাড়া কি?

আর একদিন শুধিয়েছিল রত্না, এসব কাজ তুমি করো কেন যমুনা?

দেখ রত্না, আর যার মুখেই ও প্রশ্নটা শোভা পাক—তোদের মতো মেয়ের মুখে পায় না। ফের কোনদিন ও ধরণের কথা বলবি তো এক থাপ্পড় খাবি—

ভয়ে ভয়ে সরে গিয়েছিল রত্না হীরকের সামনে থেকে সেদিন।

।। পনেরো ।।

যেদিন থেকে রত্নার পুরুষ সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে, পুরুষেরা তার কাছে আসতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই পুরুষ সম্পর্কে তাদের মতো মেয়েমানুষের প্রতি যে অভিজ্ঞতাটা তার হয়েছিল এবং ক্রমশঃ যে অভিজ্ঞতাটাই সত্য বলে তার কাছে মনে হয়েছিল, যমুনাপ্রসাদ যেন সেই অভিজ্ঞতাটার মূলেই একটা প্রচণ্ড নাড়া দিল।

তার কাছে আসবে অথচ তাকে স্পর্শ করবে না—এ আবার কেমন পুরুষ!

অথচ হীরালাল, যে যমুনাকে রত্নার ওখানে নিয়ে এসেছিল, সে-ই বলেছিল, ওর অনেক টাকা আছে রত্না। ওকে যদি বেঁধে রাখতে পারো, জীবনে আর অভাব কোনদিন হবে না।

এবং হীরালালই বলেছিল, যমুনাপ্রসাদ মদ্যপানও করে।

কিন্তু কোনদিন যমুনাপ্রসাদকে মদ্যপান করতেও দেখে নি রত্না।

মদ খায় না, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয় না অথচ মেয়ে মানুষের বাড়িতে আসে—এ আবার কেমন পুরুষমানুষ!

রত্না কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যেতো প্রথম প্রথম।

ভেবেছে ওকে আসতে নিষেধ করে দেবে কিন্তু পারে নি।

কারণ অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে মানুষটার।

ভয় ভয় করে, তবু মোহ যেন কাটে না।

বেচারী রত্না জানতেও পারে নি সেই মোহ আর আকর্ষণই ক্রমশঃ ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল। ভালবেসে ফেলেছিল মানুষটাকে রত্না।

সোজাসুজি তাকাতে মানুষটার মুখের দিকে রত্নার সাহস হয় নি, দূর থেকে আড়াল থেকে দেখেছে যমুনাপ্রসাদকে।

দেখতে দেখতে চোখের কোল দুটো তার জলে ভরে উঠেছে।

পাশের ঘর থেকে হয়তো ঐ সময় যমুনাপ্রসাদ ডেকেছে, এই রত্না, কোথায় গেলে?

চোখের জল মুছে রত্না এসে আবার ঘরে ঢুকেছে, ডাকছিলে?

পরিষ্কার করে বিছানাটা পেতে দাও। ঘুমাবো।

আলমারি থেকে পরিষ্কার ধোয়া চাদর বের করে বিছানায় পেতে দিয়েছে সযতনে রত্না।

তারজন্য কোন ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা নেই। সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যমুনাপ্রসাদ।

চার-পাঁচ ঘণ্টা একটানা ঘুমাবার পর উঠে চলে গিয়েছে পরদিন প্রত্যুষে আবার যমুনাপ্রসাদ।

ঘুম দেখে মনে হয়েছে রত্নার কতদিন, ঘুমাবার জন্যই বোধহয় যমুনাপ্রসাদের মধ্যে মধ্যে তার কাছে আসে।

কোনদিন কোন কিছু হাত পেতে চায় নি রত্না যমুনাপ্রসাদের কাছে।

প্রথমদিন অবিশ্যি যমুনাপ্রসাদ রত্নাকে টাকা দিতে এলে রত্না শুধিয়েছিল, কি?

যমুনাপ্রসাদ যেন একটু বিরক্তভরা কণ্ঠেই বলে উঠেছিল, কি আবার টাকা—নাও—ধর—

নোটগুলো এগিয়ে দেয় যমুনাপ্রসাদ রত্নার দিকে।

রত্নার দিক থেকে কিন্তু কোন আগ্রহই প্রকাশ পায় না ঐ টাকার ব্যাপার।

কি হলো, নাও।

যমুনাপ্রসাদ আবার তাগিদ দেয়।

তবু নিষ্ক্রিয় রত্না।

চুপচাপ বসে থাকে।

কানে শুনতে পাচ্ছো না আমার কথা?

যমুনাপ্রসাদের কণ্ঠস্বরটা রীতিমত যেন কর্কশ শোনায়।

থাক, ও দিতে হবে না। মৃদুকণ্ঠে এতক্ষণে রত্না জবাব দেয়।

কেন, টাকা নাও না?

নিই—

তবে ?

আপনাকে দিতে হবে না।

কেন বল তো ?

নাইবা শুনলেন সে কথা।

ক্ষণকাল অতঃপর রত্নার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যমুনাপ্রসাদ, তারপর বলে, দেখো সুন্দরী, তোমার একটা কথা জানা দরকার—সহজ পথে আমি চলি না সে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কিন্তু অন্ধকারে যা-ই করি না কেন—তোমাদের শাস্ত্রমতে যত দুষ্কৃতিই আমি করি না কেন—তোমাদের মেয়ে জাতটার 'পরে আমার কোন লোভ নেই, বোঝাতো ?

তবে—

তবে এখানে কেন এসেছি ! এইজন্য এসেছি যে এখানে রাতটা কখনো কখনো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটাতে পারবো ভেবে। আর সেইজন্যই আমি মূল্য ধরে দিতে চাই—বুঝতে পেরেছো ?

[illegible] না নাই [illegible]তঃপর টাকা নিয়েছিল রত্না।

এবং তারপর যখনই দিয়েছে তখনিই নিয়েছে।

আর সেও তো কম নয়। অনেক টাকা।

একটা যেন প্রচণ্ড দম্ভের মতো, ঔদ্ধত্যে আর গর্বে মানুষটা তার কাছে এসেছে, আবার চলে গিয়েছে।

যতক্ষণ থেকেছে, ভয়ে ভয়ে বুক কেঁপেছে, চোখ তুলে তাকাতে পারে নি রত্না ওর দিকে, তারপর যখন চলে গিয়েছে নিশ্চিন্তে বসে চোখের জল ফেলেছে।

এ যে কি আকর্ষণ আর কি ভয় মুখ ফুটেও কারো কাছে বলতে পারে নি কোনদিন রত্না।

হীরালাল একদিন শুধিয়েছিল, কেমন লাগে রত্না মানুষটাকে ?

বড় ভয় করে।

ভয় করে ? সেকি ? না, না—ও একেবারে সাচ্চা। একেবারে খাঁটি জহরৎ। ওকে ভয় করবার কিছু নেই।

আজ ঘুমন্ত যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই কথাই মনে হচ্ছিল রত্নার।

ভয় করেছে লোকটাকে এতদিন সে সত্যিই, কিন্তু যখন পায়ের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিল, তখন লোকটাকে কি অসহায়ই না মনে হচ্ছিল!

আর একটা কথা যেন বিচিত্র একটা সুরে রত্নার মনের মধ্যে গুণগুণ করেছিল। যমুনাপ্রসাদ তাকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছে।

পা ঠিক হয়ে গেলে, সুস্থ হয়ে উঠলেই চলে যাবে যখন, এ সব কথা হয়তো কিছুই ওর আর মনে থাকবেনা।

সেই দম্ভ আর ঔদ্ধত্যের মধ্যেই ও আবার দূরে চলে যাবে তার কাছ থেকে।

তবু! তবু তো বলেছে একবারও! মিথ্যা হোক—তবু তো বলেছে, রত্না তার স্ত্রী!

হঠাৎ যমুনার মৃদু কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে রত্না।

রত্না! ডাক্তারবাবু চলে গেছেন?

হ্যা।

অপারেশন হয়ে গেছে?

হ্যা।

কি বললো ডাক্তারবাবু, পা-টা আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে তো?

যাবে বৈকি।

হ্যা, ভাল হয়ে উঠতে হবে। ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়ের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করতে হবে। ওকে আমি ছাড়বো না। ও আমাকে ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়িতে আচমকা এসে ধরে ফেলে ভেবেছিল, বুঝি খুব খেল দেখিয়েছে। কিন্তু ও আমাকে চেনে না—সুস্থ হয়ে নিই—এমন খেল দেখাবো ওকে, যে জীবনেও ভুলবে না। আর হারামজাদা আমীরুল্লা—শয়তান—নিজে বেটা দূরে থেকে দশজনের হাতে দড়ি পরাবে, ওকে এবারে দেখবো।

অত কথা বলো না, ডাক্তারবাবু নিষেধ করে গিয়েছেন—

থামো! ডাক্তারবাবু নিষেধ করে গিয়েছেন! কেন? হয়েছে-টা কি? মরে গেছি নাকি আমি? এভাবে মানুষ যন্ত্রণায় কেবল কাতরাতে পারে নাকি? এভাবে শুয়ে থাকতে পারে—

কি করবে বল? যখন—

উঠতেও মানা নাকি?

না। দু-একদিন পরে উঠে-হেঁটে চলে লাঠি ধরে বেড়াতে পারবে বলেছেন।

সে আমি বুঝবো। হাঁটতে পারলে আর আমি শুয়ে থাকছি—

কিন্তু তুমি না বলেছিলে, তোমাকে ধরতে পারলে—

ঐ একবারই যা হয়েছে। আসুক না—আবার ধরুক না। পারল? জেলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারল? একটু যা চিন্তা ঐ সুনন্দ রায়ের জন্যই। ও ঠিক আমার খোঁজে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতা শহরের চারপাশে।

॥ ষোল ॥

মিথ্যা বলে নি হীরক। সত্যিই সুনন্দ কয়দিন ধরে ছদ্মবেশে শ্রীরামপুরে মণিমল্লিকের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

যদি কোনক্রমে সে হীরককে দেখতে পায় সতর্ক করে দেবে তাকে।

বলবে, পালাও। যতদূরে পারো পালিয়ে যাও। এ তল্লাটে আর থেকো না। ওরা এখনো তোমার সত্য পরিচয়টা জানে না।

কিন্তু হীরক যদি পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি কে?

কি জবাব দেবে হীরকের সে প্রশ্নের তখন সুনন্দ?

তাছাড়া হীরক যদি তাকে চিনে ফেলে?

সুনন্দ রায়কে তো সে বিশ্বাস করবে না।

কেমন যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় সুনন্দর।

একটা ব্যাপার সুনন্দ জানত না।

যে গুপ্তচরের মুখে সন্ধান পেয়ে সে আচমকা গিয়ে ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে হানা দিয়ে হীরককে ধরেছিল, সে গুপ্তচর আমীরুল্লা খানেরই লোক।

আমীরুল্লা খানকে মৃগাঙ্কমোহন মৃত্যু-মুহূর্তে চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু হীরক তার আগেই চিনেছিল আমীরুল্লা খানকে এবং দুর্ভাগ্য আমীরুল্লাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল।

শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তাই বৃদ্ধ আমীরুল্লা খান। হীরক হয়তো যে-কোন মুহূর্তেই তার মুখোস খুলে দিতে পারে।

অতএব যত শীঘ্র সম্ভব হীরককে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় বৃদ্ধ আমীরুল্লা খান।

তাছাড়া ইদানীং ক্রমশঃ যেন হীরক তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

সেটাও আমীরুল্লা খানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর হচ্ছিল না।

পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমীরুল্লা খান। এবং সেই সময়েই ওর মাথায় পুলিসে গোপন সংবাদ দিয়ে হীরককে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবার মতলবটা জাগে।

নিজের লোক দিয়ে সবানোর চাইতে শত্রুকে ঐভাবে সরানোই ভাল।

হীরক ধরা পড়লো।

কিন্তু আমীরুল্লা খান স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, জেল থেকে হীরক আবার বেরিয়ে আসবে। তাই ভূত দেখার মতোই যেন চমকে উঠেছিল আমীরুল্লা খান সে রাত্রে তার শয়নঘরে হীরককে দেখে।

একটু রাত করেই সেদিন ফিরছিল গৃহে আমীরুল্লা খান।

পুরাতন ভৃত্য নবীবক্সেরও বয়স হয়েছিল। চোখে ভাল দেখতে পায় না।

গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে আমীরুল্লা, নবী বলে, কে একজন বাইরের ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে খান সাহেব।

কে?

তা তো জানি না। একজন বৃদ্ধ ফকির বলেই তো মনে হলো।

বৃদ্ধ ফকির! একটু যেন বিস্ময়ই বোধ করে বৃদ্ধ আমীরুল্লা। এতরাত্রে কে আবার ফকির তার জন্য অপেক্ষা করছে!

চিন্তিত মনেই যেন একটু খান সাহেব বাইরের ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। সেই আলোতেই নজরে পড়লো আমীরুল্লার—সোফার 'পরে বসে এক বৃদ্ধ ফকির।

কে?

সেলামালেকম খান সাহেব—মৃদু চাপা কণ্ঠে ফকির উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ নুয়ে হয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

সেলামালেকম। বৈঠিয়ে—

ফকির কিন্তু না বসে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটায় ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ফকিরকে সাহেব, কিন্তু তার আগেই ফকির বললে, আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে খান সাহেব—বলতে বলতে ফকির এগিয়ে এলো।

একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো।

খান সাহেব একটু যেন বিমূঢ়।

চিনতে পারছ খান সাহেব আমাকে?

কে। কে তুমি?

চিনতে পারছ না? বলতে বলতে মুখ থেকে মিথ্যা দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে, দেখ তো এবারে চিনতে পারছ কি না?

শোভানাল্লা! যমুনাপ্রসাদ! তুম্—

হ্যাঁ, যমুনাপ্রসাদ! শয়তান—তুই ভেবেছিলি আমার উপরেও তুই টেক্কা দিয়ে যাবি—সবার উপরে চিরদিন যেমন টেক্কা দিয়ে এসেছিস। এ পথে একদিন তুই-ই আমাকে টেনে এনেছিলি যেমন করে আরো অনেককে টেনেছিস। শয়তান করে তুলেছিস তুই-ই আমাকে। কোকেন আর আফিমের চোরা-কারবার আর জুয়ার নেশা ধরিয়ে—

যমুনাপ্রসাদ—

হ্যাঁ, যারাই আগে তোর মুখোশের তলায় তোর আসল শয়তানের চেহারাটাকে চিনতে পেরেছে, তাদের যেমন সরিয়েছিস, ভেবেছিস—আমিও যখন তোকে চিনতে পেরেছি, তুই তাদের মতো আমাকেও সরাবি। সরিয়ে নিশ্চিন্ত হবি। বুঝতে পেরেছি, আমার বাবাকেও তুই একদিন আমারই মতো তোর দলে টেনে এনে বাবাও যেদিন তোর আসল রূপটা জানতে পেরেছিল তাকে সরিয়েছিলি—

বিস্মিত হতবাক আমীরল্লা বলে, বাবা! কে তোমার বাবা?

মৃগাঙ্কমোহন চৌধুরী, নামটা মনে আছে নিশ্চয়ই খান সাহেব, হীরক বলে।

হ্যাঁ—

তাঁরই ছেলে আমি—

শোভানাল্লা—

হ্যাঁ—আমার নাম যমুনাপ্রসাদ নয়—আমার নাম হীরক—কিন্তু শোন শয়তান—মৃগাঙ্কমোহনকে নিয়ে যে-খেলা তুই খেলেছিস—হীরককে নিয়ে সে-খেলা তোকে করতে দেবো না।

কিন্তু হীরক—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি জানি তার মৃত্যুর কারণ শয়তান—তুই-ই—

না, না—এ মিথ্যা। এ মিথ্যা কথা হীরক। তোমার বাবা মৃগাঙ্কমোহন পুলিসের এন্‌কাউন্টার থেকে পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়—

মা-র কথাও বিশ্বাস করি নি—একদিন তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু আজ আর ঐ মিথ্যা দিয়ে শয়তান তুই আমাকে ভুলাতে পারবি না। আর সেই কথাটাই জানাতে আজ তোকে আমি এসেছি।

হীরক! কি, কি তুমি চাও?

খুব শীঘ্রই তা জানতে পারবে। আজ আমি যাচ্ছি, কিন্তু আবার আমাদের দেখা হবে। আর জেনো—সেই আমাদের শেষ দেখা।

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি হীরক। দরজা খুলে বের হয়ে গিয়েছিল।

আমীরুল্লা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মধ্যে।

আমীরুল্লা খান যেন পাথরের মতোই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তার যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

যমুনাপ্রসাদ ওর নাম নয়—ওর নাম হীরক।

আর হীরক মৃগাঙ্কমোহনের ছেলে!

কিন্তু আসলে ও যেই হোক ওকে খুব ভাল করেই চিনেছে এই কয় বৎসরে আমীরুল্লা খান।

যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি বেপরোয়া। বাজে হুমকি ও দেয় না।

পরের দিনই অবিশ্যি সকালে সংবাদপত্রে আমীরুল্লা রহস্যজনকভাবে যমুনা-প্রসাদের জেল থেকে পলায়নের সংবাদটা পড়ল।

তারপর দুটো দিন কি করবে, এবারে কোন পথ নেবে বুঝে উঠতে পারে নি আমীরুল্লা খান।

বাড়ি থেকেও দুটো দিন বের হয় নি।

সর্বক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে বাড়িতে বসে থেকেছে। সর্বক্ষণ একটা আতঙ্ক।

কখন কোন পথে হীরক বুঝি এসে সামনে দাঁড়ায় অতর্কিতে সে রাত্রের মতোই।

কেন যে সে রাত্রেই তাকে হীরক হত্যা করল না, সে কথাটাও ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় নি আমীরুল্লা।

কিন্তু সে রাত্রে প্রতিশোধ না নিলেও হীরক যে প্রথম সুযোগেই তার প্রতি প্রতিশোধ নেবে, এটুকু অন্ততঃ আমীরুল্লা বুঝতে পেরেছিল এবং জানতও হীরক তাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে যায় নি—

ভাবতে ভাবতে আমীরুল্লা যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পায় এবং এবারে যে পথ নিল, সেটা হলো এতদিন মঙ্গল বা যমুনাপ্রসাদের যে সত্য পরিচয়টা সবার কাছে গোপন ছিল, সেইটাই সে হীরকের মৃত্যুবাণ হিসাবে বেছে নিল।

একটা উড়ো চিঠি অনেক মুসবিদা করে পাঠিয়ে দিল আমীরুল্লা সমস্ত প্রমাণসহ কমিশনার সাহেবের কাছে।

কমিশনার মিঃ সান্যাল চিঠিটা পড়ে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা তিনি ভাঙলেন না কারো কাছে।

একটা উড়ো চিঠি, উড়ো চিঠি তো এমন কতই আসে এবং সব কথা সেসব চিঠির সত্যও হয় না।

কাজেই কমিশনার সাহেব চট্ করে কারো কাছে প্রকাশ করলেন না কথাটা।

ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করবার জন্য নিজেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

এবং অনুসন্ধান করতে গিয়েই সন্ধান পেলেন হীরক চৌধুরী দীর্ঘদিন গৃহ-ছাড়া।

হীরক চৌধুরীর বাপ মৃগাঙ্কমোহন চৌধুরীও সমস্ত ইতিহাসটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক কিছুই জান ত পারলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সান্যাল সাহেব মণিমঞ্জিলের প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য সর্বক্ষণ প্লেন ড্রেসের একজন তরুণ, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান গোয়েন্দা অফিসার রণবীর সেনকে সকলের অজ্ঞাতে নিযুক্ত করলেন।

রণবীর সেন ছেলেটি সত্যিই ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। সে শ্রীরামপুরে এসে সর্বপ্রথম বাইরে থেকে মণিমঞ্জিল ও তার আশপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

সুনন্দ কিন্তু ব্যাপারটা বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানতে পারল না।

মণিমঞ্জিল শহরের একেবারে এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বাড়িটা।

বাড়িটা বহুদিন আগেকার। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর স্ট্রাকচারের বাড়ি।

শোনা যায়, কোন-এক সময় বাড়িটা তৈরি করেছিল নাকি কোন এক প্রতিপত্তিশালী রায় রায়াণ উপাধিধারী জমিদার।

বড় বড় থাম, খিলান, গম্বুজ। মধ্যস্থলে সুউচ্চ একটি গম্বুজের মতো ঘর। ঐ ঘরটি নাকি ছিল সূর্য-ঘর।

একতলা থেকে বরাবর লোহার পাতের তৈরি সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে ঐ গম্বুজ-ঘরে বা সূর্য-ঘরে।

ঐ সূর্য-ঘরে উঠে প্রতিদিন প্রত্যুষে রায় রায়াণ সূর্য প্রণাম করতেন, জবাকুসুম শংকাসন কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।

চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ বারান্দা। মধ্যস্থলে ঘরগুলি।

সর্বসমেত বাড়িটি দ্বিতল হলেও বাইরে থেকে দেখতে যেন একেবারে বিরাট প্রাসাদের মতো। বলতে গেলে একপ্রকার গঙ্গার কূলেই ছিল বাড়িটা।

বাড়ির পশ্চাৎ দিকে উদ্যান প্রায় দেড় বিঘে জমির ওপরে। সীমানা প্রাচীরে ঘেরা।

বাড়িটা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী শোনা যায়।

রায়রায়াণ বংশ একদা সম্মানে, অর্থে ও প্রতিপত্তিতে দেশের ধনী-শ্রেণীর অন্যতম ছিল। সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল রায়েদের সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে।

কিন্তু মা লক্ষ্মী চিরচঞ্চলা।

চঞ্চলা লক্ষ্মী রায়রায়াণদের একদিন ছেড়ে চলে গেলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে একে একে বছর কুড়ির মধ্যেই তাদের সৌভাগ্য-দেউটিগুলো নিভে গেল।

ঐ বংশেরই প্রতাপনারায়ণ রায়ের কাছ থেকে মৃগাঙ্কমোহন মণিমঞ্জিল ক্রয় করে নেন।

গঙ্গা বক্ষ দিয়ে নৌকায় করে যাচ্ছিলেন একসময় মৃগাঙ্কমোহন এবং সেই সময়ই গঙ্গা-বক্ষ থেকে মণিমঞ্জিল তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে।

গঙ্গা-বক্ষ থেকে প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি তাঁকে মুগ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা তীরে লাগিয়ে খোঁজ নিলেন প্রাসাদটি কার।

বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণ তখন একাকী—স্ত্রী, পুত্র সকলকে হারিয়ে একটিমাত্র বৃদ্ধ ভৃত্যকে সম্বল করে ঐ অট্টালিকার মধ্যে বাস করছিলেন যেন যক্ষের মতো।

মৃগাঙ্কমোহন প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে মণিমঞ্জিল কিনতে চাওয়ায় প্রতাপনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হলেন বটে, তবে বললেন, এয় করতে চান আপনি মণিমঞ্জিল ক্রয় করুন চৌধুরীমশাই, কিন্তু—

কি?

অভিশপ্ত এই মণিমঞ্জিল।

অভিশপ্ত!

হ্যাঁ, রাজা-কনকনারায়ণ মানে রায় রায়াণ আমার পিতামহ, শোনা যায় এখানে একটি ভগ্ন শিবমন্দির সহ জায়গাটা ক্রয় করেন এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাছ থেকে একপ্রকার জোর করেই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। তারপর এখানে এই প্রাসাদ তৈরি করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়েছিল—এ গৃহে যারাই থাকবে তাদেরই বংশ লোপ পাবে।

মৃগাঙ্কমোহন হেসে বলেছিলেন, অন্ধ কুসংস্কার—

হতে পারে। তবে আমাদের বংশে আমিই শেষ মানুষ। আমার মৃত্যুর পর রায় রায়াণের বংশ নিশ্চিহ্ন হবে।

অবিশ্যি, আপনার যদি কোনরকম কিন্তু থাকে, আমার বলবার কিছু নেই—তবে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই জানবেন।

নামমাত্র মূল্যেই মৃগাঙ্কমোহন অতঃপর মণিমঞ্জিল ক্রয় করে নিলেন।

ঐ কাহিনীও স্থানীয় এক বৃদ্ধের মুখ থেকেই রণবীর শোনে।

বর্তমানে ঐ বিরাট প্রাসাদের সবটাই প্রায় খালি পড়ে আছে।

থাকার মধ্যে রয়েছে মৃগাঙ্কমোহনের বিধবা স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবী, তার পুত্রবধূ কাঞ্চনা ও একমাত্র পৌত্র বাবলু।

আর আছে একজন পুরাতন দরোয়ান, একটি পুরাতন ভৃত্য মধু ও প্রৌঢ়া ঝি সরলা।

মৃগাঙ্কমোহনের একমাত্র ছেলে হীরক চৌধুরী বছর পাঁচেক প্রায় নিরুদ্দেশ।

রাত্রির অন্ধকারে ছায়ার মতো মণিমঞ্জিলের চারপাশে ঘোরে রণবীর।

পশ্চাতে সীমানা-প্রাচীরের এক জায়গায় খানিকটা ভেঙে গিয়েছে।

সেই ভগ্ন অংশ দিয়ে অনায়াসেই পশ্চাতের উদ্যানে প্রবেশ করা যায়। তবে বহুদিনের অযত্নে ও সংস্কারের অভাবে উদ্যানটি বর্তমানে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে বললেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না।

কেবল যে রণবীরই রাত্রির অন্ধকারে মণিমঞ্জিলের চারপাশে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাই নয়—সুনন্দও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুনন্দর নজরে পড়ে সহসা একদিন রাত্রে দূর থেকে রণবীরের ওপরে।

চমকে ওঠে সে, কে লোকটা!

ছায়ার মতো তাকে অতঃপর অনুসরণ করে নিজেকে আড়াল করে করে। এবং আরো বিস্মিত হয় যখন বুঝতে পারে, সে হীরক চৌধুরী নয়।

হীরক চৌধুরী নয় তো কে লোকটা? কি লোকটার পরিচয়? আর কেনই বা অমনি করে ছায়ার মতো আত্মগোপন করে মণিমঞ্জিলের চারপাশে ঘুরছে রাত্রির অন্ধকারে?

এবং দিন তিনেক সর্বক্ষণ লোকটাকে অনুসরণ করে করে শেষ পর্যন্ত স্থির করে সামনা-সামনি অতর্কিতে লোকটাকে আক্রমণ করে সুনন্দর জানতে হবে, লোকটার সত্যকার পরিচয় কি? আর কেনই বা সে এখানে ঘুরছে?

পরের রাত্রেই অতর্কিতে একসময় পিছন থেকে রণবীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল সুনন্দ।

কে তুই? বল—সত্যি কথা বল?

কিন্তু রণবীরও তখন বোবা হয়ে গিয়েছে যেন।

আক্রমণকারীকে তার অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে দেরি হয় নি। ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায়।

স্যার আপনি!

কে?

আমি রণবীর সেন।

সুনন্দ রণবীরকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

রণবীর তুমি! তুমি এখানে কেন?

মণিমঞ্জিলের ওপর দৃষ্টি রাখছিলাম।

কিন্তু কেন?

ঠিক যে কারণে স্যার আপনি এখানে।

আমি! তুমি, তুমি জান—কেন এখানে আমি"

জানি বৈকি স্যার, আচ্ছা স্যার, চলি—কথাটা বলে চকিতে অন্ধকারে উদ্যানের গাছপালার মধ্যে যেন রণবীর সেন মিলিয়ে গেল।

ভূতগ্রস্তের মতোই যেন দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে সুনন্দ।

তবে কি—তবে কি হীরক চৌধুরীর সত্যকারের পরিচয়টা পুলিস জেনে ফেলেছে?

নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু জানল কি করে?

॥ সতেরো ॥

সুনন্দর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

হীরক চৌধুরীর সত্য পরিচয় পুলিস তাহলে জেনেছে আজ।

পুলিস জেনেছে মঙ্গল বা যমুনাপ্রসাদের সত্যিকারের পরিচয়টা।

সুনন্দর সব চেষ্টাই তাহলে বিফল হয়ে গেল।

পুলিসের যখন নজর আছে মণিমঞ্জিলের ওপর, হীরক চৌধুরী এখানে এলেই তো ধরা পড়বে। আর ধরা পড়লে এবারে হীরক চৌধুরীর যে চরম দণ্ড হবে, সে বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ।

বাঁচাতে পারল না চৌধুরীবংশকে সে, কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে পারল না।

সমস্ত দুনিয়া আজ জেনে যাবে চৌধুরীবংশের কলঙ্কের কথা।

ওদিকে দিন সাতেক পরে চন্দননগরের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় হীরক একা ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল, রত্না কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনবার জন্য বাজারে গিয়েছে।

লাঠির সাহায্যে ইতিমধ্যেই হীরক হাঁটতে শুরু করেছিল।

তাই হীরক স্থির করেছিল, দু-একদিনের মধ্যেই চন্দননগর ত্যাগ করে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে।

বেশিদিন চন্দননগরের মতো ছোট জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়।

ব্রীজলালকে তাই সংবাদ পাঠিয়েছিল হীরক, তার গাড়িটা নিয়ে আসবার জন্য।

বারান্দায় জুতোর শব্দ পেয়ে উঠে বসে হীরক।

কে?

আমি। ব্রীজলাল এসে ঘরে ঢুকল।

আর ঠিক সেইসময় হন্তদন্ত হয়ে এসে রত্না ঘরে ঢুকল।

আর এক মুহূর্তও তোমার এখানে থাকা চলবে না, হাপাতে হাঁপাতে রত্না বলে।

কেন?

বাজার যাবার পথে আশু ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব, এগুচ্ছি,হঠাৎ—

কি? থামলে কেন?

ডিসপেনসারির সামনে দেখলাম একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার কথা বলছে—

তোমাকে তারা দেখতে পেয়েছে?

না।

পুলিস! নামটা রত্নার মুখে শুনেই হীরক যেন কেমন চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আশু ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে পুলিস অফিসার কথা বলছে কেন?

কি কথা!

উদ্বিগ্ন রত্না আবার বলে, কি ভাবছো?

রত্না!

কি?

প্রস্তুত হয়ে নাও, এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে—কথাটা বলে তাকাল ব্রীজলালের দিকে হীরক।

ডাকল, ব্রীজলাল?

কি?

তোমার গাড়ি এনেছ?

জী।

চল। আর এক মুহূর্তও তবে দেরি নয়। তারপরই রত্নার দিকে তাকিয়ে বলল, রত্না চল—

রত্না একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হীরকের ডাকে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

হাঁ করে চেয়ে আছ কেন, চল—

তুমি যাও। শান্তকণ্ঠে বলে রত্না।

তুমি যাবে না?

না।

সেকি! তোর কি মাথা খারাপ হলো রত্না? ওরা এসে তোকে ধরতে পারলে—

সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তোমরা যাও—বেরিয়ে পড়, আর দেরি করো না—

না রত্না, তোমাকে ফেলে আমি যাব না।

যাও। যাও তোমরা, কেন দেরি করছ? আমি কোথাও যাব না, এখানেই থাকবো।

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? চল—

না, বললাম তো তোমরা যাও।

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রত্না।

যাবি না?

না।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে ওঠে হীরক।

বলে, তবে থাক ও এখানে পড়ে। মরুক গে—চল ব্রীজলাল।

ব্রীজলালের সঙ্গে বের হয়ে গেল হীরক।

মোটরে উঠে ঝড়ের গতিতে ব্রীজলাল গাড়ি ছেড়ে দিল।

খোলা দরজাটার 'পরে দাঁড়িয়ে থাকে রত্না।

চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে যায়—ঝাপসা দৃষ্টিতে সে দেখে—একটা ধূলোর ঘূর্ণি ঘুরতে ঘুরতে আকাশে মিলিয়ে গেল।

চোখের জল মুছে দরজাটা বন্ধ করে ভিতরের ঘরে এসে ঢুকল রত্না।

মঙ্গলের শয্যাটা শূন্য। একটু আগেও ঐ শয্যাতেই শুয়ে ছিল মঙ্গল।

তখনো যেন ঘরের বাতাসে রয়েছে তার গায়ের গন্ধ।

না, সে কি যেতে পারে? সে কোথায় যাবে? এ যে তার স্বর্গ! এইখানেই

যে পেয়েছিল সে মঙ্গলকে সত্যিকারের পাওয়া। এই স্বর্গেই যে মঙ্গল তাকে স্ত্রী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই ঘর তার জীবনের মহাতীর্থ।

একসময় মঙ্গলের শূন্য শয্যাটার ওপরে লুটিয়ে পড়ল রত্না।

দুহাতে মঙ্গলের বালিশটা বুকের তলায় চেপে ধরে হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রত্নার অনুমান মিথ্যা নয়।

আশু ডাক্তারের অ্যাসিস্টেন্ট এবং কম্পাউণ্ডার বিনয় সত্যিই পুলিসে সংবাদ দিয়েছিল।

প্রথম দিনই আশু ডাক্তারকে অ্যাসিস্ট করতে এসে বিনয়ের মনকে কেমন যেন সন্দিগ্ধ করে তোলে।

কলকাতা থেকে এসেছে ওরা ঐ অবস্থায়, কলকাতাতেই তো চিকিৎসা করানো উচিত ছিল। কলকাতা শহরে কত বড় বড় সব নাম-করা সার্জন ও হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে অপারেশন না করিয়ে চন্দননগরে এল কেন ওরা?

ডাক্তারকে কিন্তু কিছু বলে না বিনয়। গোপনে গোপনে কেবল তাদের ওপরে নজর রাখে।

ছয়-সাত দিন পরে হঠাৎ একটা পুরাতন খবরের কাগজ মুড়িয়ে বাজার থেকে একটা ধুতি কিনে এনেছিল বিনয়, সেই খবরের কাগজটার একটা জায়গায় নজর পড়তেই বিনয় চমকে ওঠে।

মঙ্গলের ফটো সহ সরকারের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাটা ছিল ঐ খবরের কাগজে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে সেদিনকার রোগীর মুখটা।

হুবহু খবরের কাগজের ছাপা ফটোর সঙ্গে মুখটার মিল রয়েছে।

পরের দিনই একটা ছুতো করে রোগীর বাড়িতে গিয়ে মঙ্গলকে আর একবার দেখে আসে এবং নিঃসন্দেহ হয় সে।

আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

এক মুহূর্তও আর দেরি করে না বিনয়। ঐ দিনই চলে যায় কলকাতায় এবং লালবাজারে গিয়ে মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে।

মিঃ মুখার্জী বলেন, এই লোকই সেই লোক আপনি বলছেন?

কোন ভুল নেই স্যার তাতে।

আপনার কোন ভুল হয় নি?

গেলেই তো সেখানে সব সত্য মিথ্যা জানতে পারবেন স্যার।

মিঃ মুখার্জী আর দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কে নিয়ে গাড়িতে চন্দননগরের দিকে রওনা হলেন।

হীরক চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে চার-পাঁচ জন আর্মড পুলিস নিয়ে চন্দননগরের কমিশনারকেও সঙ্গে নিয়ে মিঃ মুখার্জী রত্নার বাড়ির সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালেন।

সঙ্গের অফিসারকে বললেন, বাড়িটাকে আগে ঘিরে ফেলুন। এবং হুকুম দেওয়াই রইলো আমার, পালাবার চেষ্টা করলে—জীবিত যদি না ধরতে পারেন তো গুলি চালাবেন।

কমিশনার সাহেব আর্মড পুলিসদের সেই কথা জানিয়ে দিলেন।

বন্দুকধারীরা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

নিজে মিঃ মুখার্জী অতঃপর বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার কড়া ধরে নাড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোন সাড়া নেই কারো।

ভিতরে যে লোক আছে বোঝা যায়—ভিতরে আলো জ্বলছে অথচ কেউ সাড়া দেয় না।

কড়া নেড়ে মুহুর্মুহু দরজায় ধাক্কা দিয়েও যখন কারো কোন সাড়া পাওয়া গেল না বা দরজা খুললো না, মিঃ মুখার্জী পার্শ্বে দণ্ডায়মান কমিশনারকে শুধালেন, নাউ হোয়াট টু ডু মিঃ ঘোষ?

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা ব্যতীত তো আর কোন পথ দেখছি না মিঃ মুখার্জী, ঘোষ বলেন।

তখন দুজন গুর্খা আর্মড পুলিসকে ডেকে এনে দরজা ভাঙবার নির্দেশ দিলেন কমিশনার মিঃ ঘোষ।

শক্ত কাঠের দরজা। অনেক চেষ্টার পর বাইরের দরজা ভাঙা গেল।

ভিতরের ঘরের মধ্যে তখনো আলো জ্বলছে। ভিতরের ঘরের দরজাটাও বন্ধ।

এবারে কিন্তু মিঃ মুখার্জী থমকে দাঁড়ালেন।

এত কাণ্ডের পর বাড়ির মধ্যে ঢুকে কিনা এখনো ভিতরের ঘরের দরজাটা বন্ধ, অথচ ভিতরে আলো জ্বলছে।

ওদিকে একটা জানালা ছিল। জানালাটা খোলা।

সেই জানালা-পথেই উঁকি দিয়ে দেখলেন একটি তরুণী শয্যার 'পরে বালিশে হেলান দিয়ে পাথরের মতো বসে আছে।

কিন্তু ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী আছে কি না বুঝতে পারলেন না।

মুহূর্তকাল ভাবলেন। তারপর মিঃ ঘোষকে পিস্তল হাতে বন্ধ দরজার দিকে চুপিচুপি এগিয়ে যেতে বলে নিজে পিস্তলটা উঁচিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজা খুলুন। জানালা-পথে মিঃ মুখার্জী নির্দেশ জানান।

তরুণীটি যেমন পাথরের মতো বসেছিল তেমনিই বসে রইল।

কোন সাড়া দেয় না তাঁর কথায়!

দরজা খুলুন। শুনেছেন—দরজা খুলুন।

তবু মেয়েটি সাড়া দেয় না।

অগত্যা সকলে দরজা ভেঙেই ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আশ্চর্য, তরুণীটি বালিশে হেলান দিয়ে পূর্ববৎ বসে থাকে, নড়ে না বা সাড়া দেয় না।

একবার থমকে দাঁড়ালেন মিঃ মুখার্জী।

ব্যাপারটি কি তখনো যেন ঠিক তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

তরুণী কি ঘুমিয়ে নাকি?

তারপরই মনে হয়, অসম্ভব।

এত চেঁচামেচি ও শব্দের পরেও কি কেউ ঘুমাতে পারে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। মৃত নয়তো তরুণী?

মনের মধ্যে সন্দেহটা জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তরুণীর দেহটা স্পর্শ করতেই যেন তিনি চমকে ওঠেন।

বরফের মতো ঠাণ্ডা। একেবারে পাথর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে শয্যার পরে নজর পড়লো তাঁর।

সামনেই পড়ে 'পয়জন' লেখা একটি শূন্য শিশি।

মিঃ ঘোষই মৃদুকণ্ঠে বললেন, সি ইজ্ ডেড্ মিঃ মুখার্জী।

মিঃ মুখার্জী মৃদুভাবে একবার মাথা নাড়লেন মাত্র।

কে এই মেয়েটি মিঃ মুখার্জী?

জানি না।

Now what to do? মিঃ ঘোষ বলেন।

কি আর করা যাবে। চলুন একবার সমস্ত বাড়িটা সার্চ করে দেখা যাক। মিঃ মুখার্জী বলেন।

সমস্ত বাড়ি সার্চ করেও আর কাউকে পাওয়া গেল না।

মৃতদেহ আপাততঃ ওখানকার পুলিসের হাতেই জমা করে দিয়ে মিঃ মুখার্জী জীপে উঠে বসলেন।

কম্পাউণ্ডার বিনয়কে কিন্তু ছাড়েন নি মিঃ মুখার্জী। তাকে আগাগোড়াই সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলেন।

জীপে উঠে ড্রাইভারকে আশু ডাক্তারের ডিসপেনসারির দিকে চালাতে বললেন।

ডিসপেনসারির সংলগ্ন একটা বাড়িতেই আশু ডাক্তার থাকেন। বিনয় কম্পাউণ্ডারই কথাটা বলেছিল।

আশু ডাক্তার অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করেন। তখন জেগেই ছিলেন। ডাক শুনে নেমে এলেন।

বিনয় সরে যেতে চেয়েছিল কিন্তু মুখার্জী তাকে যেতে দিলেন না।

পুলিসের বেশ পরিহিত মিঃ মুখার্জীকে দেখে অত রাত্রে কেমন যেন থতমত খেয়ে যান আশু ডাক্তার।

হঠাৎ ঐ সময় বিনয়ের প্রতি তাঁর নজর পড়লো—বিনয়, তুমি? মিঃ মুখার্জী তখন হেসে বললেন, ওর কাছে আর কি শুনবেন, আমিই বলছি—বলে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

হঠাৎ যেন আশু ডাক্তারের মুখটা কঠিন হয়ে গেল।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তা আমার কাছে কেন?

মেয়েটি সম্পর্কে আরো details কিছু আপনি জানেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—শুধালেন মিঃ মুখার্জী। কে, কি নাম মেয়েটির?

আমার পুরানো client, নাম রত্না রায়। বলেন আশু ডাক্তার।

আর কিছু জানেন?

না।

যাকে আপনি অপারেশন করেছিলেন তিনি কে জানেন নিশ্চয়ই?

জানি, মেয়েটির স্বামী সুধাংশু রায়।

তার সম্পর্কে আর কিছু জানেন?

না।

কিন্তু আপনি যে তাকে অপারেশন করেছিলেন—সাক্ষী দিতে ডাকলে সে কথাটা বলবেন তো?

কেন বলবো না?

বেশ। তাহলেই হবে—আচ্ছা চলি, নমস্কার।

মুখার্জী দলবল সহ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই আশু ডাক্তার বিনয়কে ডাকলেন, বিনয়—

বিনয় পাশ কাটাবার ফিকিরে ছিল কিন্তু তা আর হলো না।

ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছেন স্যার ?

হ্যাঁ, শোন, কাল থেকে আর তুমি আমার ডিসপেনসারিতে আসবে না।

কিন্তু স্যার—

হ্যাঁ—আমার প্রয়োজন কম্পাউণ্ডারের, স্পাইয়ের নয়। যে কাজ করেছো এবার থেকে সেই কাজই করো—তাতে উপার্জনও হবে, পেটও ভরবে—যাও।

বিনয় তবু যেন কি বলবার চেষ্টা করে কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে আশু ডাক্তার বললেন, আর একটি কথাও নয়—যাও।

বিনয় বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আশু ডাক্তার আবার বলেন, কাল সকালে যে-কোন একসময় এসে তোমার মাইনেপত্তর বুঝে নিয়ে যেও। যাও—

বিনয় ঘর থেকে বের হয়ে গেল মাথা নীচু করে, আশু ডাক্তার ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

চোখের উপর ভেসে ওঠে রত্নার মুখখানা।

॥ আঠারো ॥

সেই রাত্রেই হীরক কিন্তু পথে আসতে আসতে শ্রীরামপুরের রেলওয়ে ক্রসিংটা পার হয়েই হঠাৎ সামনে চালকের সীটে বসে গাড়ি ড্রাইভিংরত ব্রীজলালকে ডাকল, ব্রীজলাল, এইখানেই তুমি গাড়ি থামাও !

এইখানেই গাড়ি থামাবো !

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে একটু যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করে ব্রীজলাল।

হ্যাঁ—এইখানে আমি নেবে যাবো।

কিন্তু স্যার—

তুমি ফিরে যাও কলকাতাতেই—

লাঠির সাহায্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল হীরক।

যদি বেঁচে থাকি, আবার যদি দেখা হয়, তোমাকে আমি ভুলবো না ব্রীজলাল। আচ্ছা, শুভ্‌রাই।

কথাটা বলে খট্ খট্ শব্দ করতে করতে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল হীরক।

রাত্রি এখনো বেশি হয় নি। বোধকরি সাড়ে-দশটা হবে। শহরের দোকান পাট এখনো সব একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।

স্টেশনের রাস্তা ধরে ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি হাতে এগুতে লাগল হীরক।

একটা ট্রেন সিটি বাজিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় লোকজনের চলাচল এখনো বেশ রয়েছে। একটা পানের দোকানে রেডিও বাজছে।

হঠাৎই নেমে পড়েছিল হীরক শ্রীরামপুরে।

হঠাৎই যেন মনে হয়েছিল সামনে পালাবার পথটা তার আজ বন্ধ।

পথ বন্ধ। আর এগুনো চলবে না। বিচিত্র একটা অনুভূতি যেন সহসা মনটাকে তার দোলা দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে শ্রীরামপুরের কথা।

তার মা। তার স্ত্রী কাঞ্চনা।

আর, আর—একটি শিশুর মুখখানা যেন মনে করবার চেষ্টা করেছে।

কেমন দেখতে হয়েছে সে শিশুটি, কে জানে।

শিশুটির জন্মাবধি তো সে দেখে নি তার সেই মুখটি।

কখনো মনে পড়ে নি হীরকের আজ পর্যন্ত সেই মুখখানা।

চন্দননগরে রত্নার কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত পর্যন্ত একটা প্রতিহিংসার কঠিন প্রতিজ্ঞায় সমস্ত শরীরের মধ্যে উষ্ণ রক্তস্রোত বইছিল। কারণ আবার যখন সে পুলিসের নজরে পড়েছে তখন বিশ্বাস নেই। যেমন করেই হোক কলকাতায় পৌঁছে আগে সেই শয়তান আমীরুল্লার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

তারপর ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়।

কিন্তু ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে বসে কলকাতার পথে যেতে যেতে হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

আমীরুল্লা আর সুনন্দ রায় যেন অকস্মাৎ মন থেকে মুছে গেল।

এমনিই বুঝি হয়। মনের মধ্যে অকস্মাৎ যেমন রঙ ধরে, তেমনি অকস্মাৎ বুঝি সব শূন্য, নিরর্থক হয়ে যায়।

কোন তুচ্ছ ঘটনা এবং কোথা দিয়ে কেমন করে বা একটি কথাকে কেন্দ্র করে সব মুহূর্তে ওলট-পালট হয়ে যায় কেউ তা জানে না। হীরকেরও হয়েছিল তাই।

গাড়িতে বসে আসতে আসতেই হঠাৎই মনে পড়েছিল রত্নার কথা।

রত্না।

রত্না কেন তার সঙ্গে এলো না?

বারবণিতার গর্ভে জন্ম এক বারবণিতা।

রত্না—ঐ বারবণিতা যদি না থাকত—এবারে তার সুস্থ হয়ে ওঠাই হয়তো অসম্ভব হতো। চিরজীবনের মতোই পঙ্গু হয়ে যেতো সে।

মনে পড়তে থাকে বিদায়কালীন অশ্রু-ছলছল দুটি চক্ষু। কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না রত্নার সেই জলভরা দুটি চক্ষুর দৃষ্টি।

শেষ কথা বলেছিল হীরক, চললাম। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই—

রত্না কোন জবাব দেয় নি। নিঃশব্দে কেবল ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

রত্নার সেই অশ্রুসজল দুটি চোখের কথা ভাবতে ভাবতেই অকস্মাৎ ভেসে ওঠে মনের পাতায় হীরকের আর একখানি মুখ।

কাঞ্চনা। তার স্ত্রী।

স্ত্রী শুধু বুঝি নামে মাত্রই। কয়দিনেরই বা দেখা! কয়দিনেরই বা পরিচয়!

তবু, তবু ত কই সে মুখখানি আজো ভুলতে পারে নি হীরক।

আর মা-র সেই প্রশ্ন, আমীরুল্লা! ও কেন এসেছিল—

হ্যাঁ—আমীরুল্লা।

আমীরুল্লাই তার জীবনের শনি। সে-ই ত তার মনে জ্বালিয়েছিল একদিন প্রলোভনের আগুন। সর্বনাশা আগুন।

খুট্ খুট্ করে হেঁটে চলছিল হীরক লাঠিটার পরে নির্ভর করে মণিমঞ্জিলের দিকে।

কতদিন পরে আবার ফিরে যাচ্ছে সে মণিমঞ্জিলের দিকে!

পা-দুটো অনভ্যাসে আর দুর্বলতায় টনটন করতে থাকে। যেন চলতে চায় না।

তবু ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির সাহায্যে প্লাস্টার করা পা-টা টানতে টানতেই যেন এগিয়ে চলে হীরক।

বাড়ির সামনে এসে যখন হীরক পৌছল, প্লাস্টার করা পা-টা যেন লোহার মতই ভারী মনে হতে থাকে।

অন্ধকার রাত।

সন্ধ্যা থেকেই বুঝি আকাশে মেঘের আনাগোনা চলছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে কখন যে মাথার উপরে রাত্রির কালো আকাশটায় আর একপোঁচ মেঘের কালি পড়েছে, নিকষ কালো হয়ে গিয়েছে আকাশটা, জানতেও পারে নি হীরক। জানবার মত মনের অবস্থাও বুঝি ছিল না হীরকের।

একটা নেশার ঘোরেই যেন মণিমঞ্জিলের দিকে প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে এগিয়ে

চলেছিল হীরক। অসহ্য গুমোটটা কেবল পরিশ্রান্ত হীরকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্মের সঞ্চার করেছিল।

মুখ তুলে তাকাল হঠাৎ হীরক সামনের দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

মণিমঞ্জিলের দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

দক্ষিণ দিকের ঐ দোতলা ঘরটাই একসময় তার ঘর ছিল। ঐ ঘরটার মধ্যে অনেক দিন অনেক রাত কেটেছে হীরকের।

ঐ ঘরের পূর্বের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেই গঙ্গা চোখের 'পরে ভেসে ওঠে।

কত সময় সেই জানালা-পথে গঙ্গার গৈরিক জলধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে হীরক।

কিন্তু এখনো ঐ ঘরে আলো জ্বলছে কেন? কাঞ্চনা কি এখনো জেগে আছে?

কাঞ্চনা!

পাঁচটা বছর! কিন্তু কই, এখনো তো সে মুখখানি স্পষ্টই আছে মনের মধ্যে!

কাঞ্চনা তার স্ত্রী!

ঐ যে-ঘরে আলো জ্বলছে ঐ ঘরের মধ্যে গিয়ে কাঞ্চনার হাত দুটি ধরে কি সে বলতে পারে না, ফিরে এসেছি কাঞ্চনা, ভুল আমার ভেঙেছে। আমাকে আশ্রয় দাও—আমাকে নতুন করে বাঁচতে দাও। আমাকে ক্ষমা করো। কাঞ্চনা কি তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেবে?

সহসা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন ওর সর্বাঙ্গের 'পরে শিরশির করে বহে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি কয়টা বৃষ্টির ফোঁটা চোখে-মুখে এসে পড়ল হীরকের। চমকে উঠলো হীরক।

এখানে সে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে?

তার সত্যিকারের পরিচয়টা কি এখনো পুলিসে পায় নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে।

আর যদি পেয়ে থাকে, তাহলে জেল-পলাতক, ফেরারী আসামী হীরক চৌধুরীর বাড়ির 'পরেও যে সর্বদা পুলিসের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে নিঃসন্দেহে।

না, না—সদর দিয়ে তো মণিমঞ্জিলে তার প্রবেশ করা হবে না।

পাঁচ বছর আগে এক নিশুতি রাত্রে অ্যাসিডে পোড়া মুখ নিয়ে যে-পথে সে গিয়ে মণিমঞ্জিলে প্রবেশ করেছিল, আজো সেই পথেই প্রবেশ করতে হবে।

পুলিসের নজরে সে পড়তে পারে না, ধরা দিতে পারে না।

আবার যে-পথে এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরে চলল হীরক।

কিছুদূর পিছিয়ে গেলেই একটা সরু গলিপথ আছে জানে হীরক।

সেই সরু নির্জন গলিপথটা ধরে অগ্রসর হলেই কিছুটা, ওদের মণিমঞ্জিলের পশ্চাতের বাগানের সীমানা প্রাচীর।

প্রাচীরের ভাঙা অংশটা কোথায় জানা হীরকের।

হীরক আবার নির্জন রাস্তা ধরে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন! সেই সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া।

খুট্ খুট্ শব্দে হীরক এগিয়ে চলল ক্লান্ত প্লাস্টার করা পা-টা টেনে টেনে লাঠির উপরে ভর দিয়ে দিয়ে।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো একবার। মুহূর্তের জন্য একটা আলোর চোখ-ঝলসানো স্ফুরণ।

॥ উনিশ ॥

বাগানের মধ্যে একটা বিরাট ঝুপড়ী জামরুল গাছের নীচে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সুনন্দ।

আজো রাত্রে সে প্রাত্যহিক প্রহরায় নিদ্রাহীন চোখে কান পেতে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ কানে এলো সুনন্দর একটা খুট্ খুট্ শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয় তার যেন তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

খুট্ খুট্ খুট্—শব্দটা মনে হয় যেন বাগানের সীমানা-প্রাচীরের ওদিকে সরু নির্জন গলিপথটা থেকেই ভেসে আসছে।

কিসের শব্দ? পায়ে পায়ে প্রাচীরের কাছে এগিয়ে গেল সুনন্দ নিঃশব্দে।

বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে।

কিন্তু কই! শব্দটা তো আর শোনা যাচ্ছে না!

আরো একটু এগিয়ে যায় সুনন্দ।

না। কোন শব্দ নেই।

শুধু অন্ধকার। আর তারই মধ্যে স্তূপীকৃত ছায়ার মতো এদিকে-ওদিকে গাছপালাগুলো।

সে রাত্রে কেবল সুনন্দ নয়, আরো একজন বাগানের আর এক অংশে ঘাপটি মেরে ছিল।

রণবীর সেন!

সেদিন দুজনে অকস্মাৎ বাগানের মধ্যে পরস্পরের দেখা হওয়ার পর সুনন্দ রণবীরকে বলেছিল, মিঃ সান্যালকে গিয়ে বলো, আমি যখন এখানে আছি, তোমার আর থাকার প্রয়োজন নেই। আমি সেরকম কোন সংবাদ পেলেই হেডকোয়ার্টারে ইনফর্ম করবো।

রণবীর সুনন্দর নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারে নি।

পরের দিনই কলকাতায় ফিরে গিয়ে মিঃ সান্যালকে সব কথা বলে।

মিঃ সান্যাল রণবীরের কথা শুনে প্রথমটায় একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন।

তিনি জানতেন, সুনন্দ ছুটি নিয়েছে বিশ্রামের জন্য। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলেই সে ছুটি নিয়েছে। তারপর মনে হয় তাঁর, গোপনে মঙ্গলের অনুসন্ধান করবে বলেই হয়তো ছুটি নিয়েছিল।

মনে মনে মিঃ সান্যাল সুনন্দর প্রশংসা না করে পারেন না।

বরাবরই ঐ তীক্ষ্ণধী ও কর্মঠ যুবকটির প্রতি তাঁর নজর ছিল। ভালও বাসতেন তিনি তাই সুনন্দ রায়কে।

তাই সুনন্দর নিরাপত্তার জন্যই রণবীরকে বললেন, ঠিক আছে রণবীর, তাকে জানাবার দরকার নেই, গোপনে যেমন তুমি ওয়াচ করছিলে, তেমনিই ওয়াচ কর গিয়ে—

কিন্তু স্যার, মিঃ রায় যদি আবার আমাকে দেখে ফেলেন ?

যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতেই, তবে দেখে ফেললে, কোন প্রশ্ন করলে বলো, আমি অর্ডার দিয়েছি।

তাই হবে স্যার আপনি যেমন বলছেন।

হ্যাঁ যাও। হীরক চৌধুরী লোকটা একটা সাংঘাতিক ক্রিমিন্যাল—ওকে আমার বিশ্বাস নেই। ও পারে না এমন কোন কাজ নেই। সুনন্দ যে বি ট্রাপ্‌ড। স্পট-এ তুমি থাকলে হয়তো তুমি তাকে সাহায্য করতে পারবে।

তাই হবে স্যার।

হ্যাঁ, আর ওখানকার থানা-অফিসার বোসকে আমি অর্ডার দিয়েছি—তুমি বা সুনন্দ যে-কোন মুহূর্তে তার কাছে কোন সাহায্য চাইলেই পাবে।

প্রাচীরের ভাঙা অংশের মধ্য দিয়ে হীরক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল।

মুহূর্তকাল দাঁড়াল। কি ভেবে এতক্ষণ পায়ে যে-জুতোটা ছিল সেটা খুলে ফেলল। খালি পায়ে এগুতে লাগল।

খালি পায়েও শুকনো ঝরা পাতায় মুচ মুচ একটা শব্দ হয়।

কয়েক পা এগিয়ে তাই দাঁড়ালো হীরক।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে তখন। সর্বাঙ্গ ভিজতে থাকে হীরকের। আবার অগ্রসর হয় হীরক। বিদ্যুৎ চমকায়।

আর সেই বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় হীরক ঘুণাক্ষরে জানতেও পারে না, মাত্র হাত পাঁচেকের ব্যবধানে দণ্ডায়মান সুনন্দ চকিতের জন্য তাকে দেখতে পায়।

চমকে ওঠে সুনন্দ। ছায়ার মতই অতঃপর সুনন্দ হীরককে অনুসরণ করে।

হীরক আগে, সুনন্দ পশ্চাতে।

একটা ব্যাপার সুনন্দর নজরে পড়ে নি, মণিমঞ্জিলের নীচের তলার একটা ঘরের একটা জানালার শিক ছিল এমনভাবে আলগা যে, শিক দুটো তুলে অনায়াসেই সেই পথে মণিমঞ্জিলের মধ্যে প্রবেশ করা যেত।

পাঁচবছর আগে এক গভীর রাত্রে ঐ জানালা-পথে ঐ শিক সরিয়েই হীরক মণিমঞ্জিলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

আজো হীরক সেই জানালা-পথেই মণিমঞ্জিলের মধ্যে প্রবেশ করল।

বৃষ্টি তখন বেশ পড়ছে ঝম্ ঝম্ করেই।

বহুকালের অব্যবহৃত ঘরটা অন্ধকার। ঘরের মধ্যে বদ্ধ বাতাস আর দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ধুলোর বিচিত্র গন্ধ। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা ভ্যাপসা গরম।

দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহার্য ও খালিই পড়ে আছে ঘরটা। একপাশে গোটা দুই আলমারি—তার মধ্যে স্তূপীকৃত সেরেস্তার খাতাপত্র।

দরজা খোলা, জানালা খোলা। কেউ ওদিকে ভুলেও আসে না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে হীরক আবার বুঝি থমকে দাঁড়ায়।

উদ্যানের পথটুকু পার হয়ে আসতে আসতেই বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ তার ভিজে গিয়েছে।

সারাটা পথ যেন কিসের একটা তীব্র আকর্ষণে চলে এসেছিল হীরক।

কিন্তু এবারে সে থমকে দাঁড়াল।

কোথায় এলো সে? কার কাছে এলো? কোথায় চলেছে সে?

এ বাড়ির কেউই কি আজ আর তাকে আপন বলে গ্রহণ করবে?

মা হয়তো তার মুখদর্শনও করবে না। স্ত্রী কাঞ্চনা, সে-ও হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর পুত্র তো তাকে চেনেই না।

তারা যদি প্রশ্ন করে, কেন তুমি এসেছ? কেন এখানে এলে?

কি জবাব আছে তার দেবার মতো?

জেল পলাতক কয়েদী। ফেরারী আসামী।

একটা ঘৃণ্য ক্রিমিন্যাল।

চোরা-কারবারী।

কিন্তু আর বুঝি এক পা-ও নড়বার ক্ষমতা নেই তার।

পা-দুটো তো বটেই, শরীরের সমস্ত পেশীগুলোই যেন অসহ্য ক্লান্তিতে অবশ, অবসন্ন হয়ে আসছে তখন। চলা তো দূরের কথা, দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই বুঝি। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা।

তবু হীরক অন্ধকারে ঘরটা থেকে বের হয়ে সামনের বারান্দায় যায়। এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট যে তার পরিচিত।

অন্ধকারেই দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু সিঁড়ির ধাপগুলো যেন আর অতিক্রম করতে পারে না।

পা-দুটো বেদনায় ও ক্লান্তিতে দুমড়ে আসে। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে।

তবু উঠতে থাকে ধাপের পর ধাপ হীরক আস্তে আস্তে।

সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করে দোতলার বারান্দায় আবার দাঁড়ায় হীরক।

সিঁড়ির রেলিংটা ধরে হাঁপাতে থাকে। টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে থাকে।

সিঁড়িতে হঠাৎ যেন ঐ সময় কার ক্ষীণ পদশব্দ কানে আসে হীরকের।

তাড়াতাড়ি বারান্দা দিয়ে আবার এগুতে শুরু করে হীরক। এবং এবারে সোজা এসে কাঞ্চনার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

ঘরের দরজায় হাত দিয়ে ঠেলে বুঝলো ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

কিন্তু দরজায় আঘাত করতে পারে না হীরক। হাতটা যেন থেমে যায়।

॥ কুড়ি ॥

ভূতগ্রস্তের মতোই যেন বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হীরক।

আর সেই মুহূর্তে মনে হলো তার, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে।

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে শব্দটা। এবং বুঝতে কষ্ট হয় না হীরকের, কারো সেটা পায়েরই শব্দ।

হীরক তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে যায়। এগিয়ে বারান্দার অন্তপ্রান্তে অন্ধকারে।

আবার বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো। এবং বিদ্যুতের আলোয় চকিতে নজর পড়লো হীরকের, সিঁড়ির ঠিক মাথায়ই দাঁড়িয়ে একটা মনুষ্যমূর্তি।

চট্ করে হীরক পা টেনে টেনে এগিয়ে যায় আরো।

মনে পড়ে হীরকের, আরো খানিকটা এগুলেই উপরের শীর্ষে সূর্য-ঘরে উঠবার পাথরের সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে।

হ্যাঁ, আপাততঃ সেই সূর্য-ঘরেই আশ্রয় নেবে হীরক।

পা চলে না। তবু অতি কষ্টে পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে সূর্য-ঘরে উঠতে থাকে হীরক।

কিন্তু পদশব্দটাও যে আসছে পিছনে পিছনে, সূর্য-ঘরের অর্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর মনে হয় হীরকের যেন হঠাৎই।

থামে হীরক। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে পশ্চাতের শব্দটা।

অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকায়। কিছুই নজরে পড়ে না।

কিন্তু আর সত্যিই যে পারছে না হীরক। পা দুটো যেন আর কিছুতেই সোজা করে রাখতে পারে না।

সিঁড়ির ধাপের উপরেই বসে পড়ে হীরক।

আবার। আবার সেই শব্দটা। আবার শোনা যায় সেই পায়ের শব্দ।

বসা হলো না হীরকের।

হীরক আবার উঠে দাঁড়াল। আবার ধাপ অতিক্রম করতে শুরু করল।

শব্দটাও আসছে পিছনে পিছনে।

শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনক্রমে হীরক গম্বুজশীর্ষে সূর্য-ঘরে এসে পৌঁছাল।

বুকটা যেন তখন ফেটে যাচ্ছে নিশ্বাসের কষ্টে।

বহুদিনের অব্যবহার্য ছোট অপরিসর ঘরটা।

কতকাল মানুষের পা পড়ে নি সূর্য-ঘরে। কত ধুলো জমে আছে মেঝেতে।

অনেকদিন আগে একবার কলেজে পড়ার সময় কৌতূহলী হয়ে ঐ সূর্য-ঘরে উঠেছিল হীরক।

মা বারবার বারণ করেছিলেন কথাটা ছেলের মুখে শোনার পর—আর কখনো যেন সে ঐ সূর্য-ঘরে না ওঠে।

রায়রায়াণ বংশের কোন এক বধূ নাকি একটা ঐ সূর্য-ঘর থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছিল।

সেই বধূটির আত্মা নাকি আজো সূর্য-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হীরক শুনে হেসেছিল সেদিন।

বলেছিল, তাতেই বা হয়েছে কি? প্রেত মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না মা।

মহাশ্বেতা বলেছিলেন, ক্ষতি করুক বা নাই করুক, ওখানে ওঠারই বা প্রয়োজন কি! উঠো না তুমি আর কখনো ঐ সূর্য-ঘরে।

তারপর আর অবিশ্যি হীরক ঐ সূর্য-ঘরে ওঠে নি।

কিন্তু আজ! আজ যেন হীরকের মনে হয় অন্ধকারে সূর্য-ঘরে কেউ সত্যিই তার পাশে রয়েছে।

একটা অশরীরী দীর্ঘশ্বাস যেন চারপাশ থেকে তাকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরছে।

নিজের অজ্ঞাতে যে হীরক কোনদিন কোন কারণে এতটুকু ভয় পায় নি, সেই হীরকেরই গায়ের মধ্যে যেন কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে।

অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

হঠাৎ ফট করে একটা শব্দ হয়, সূর্য-ঘরের জানালার কবাট দুটো হাওয়ার ঝাপটায় খুলে গেল। এক ঝলক জলে-ভেজা হাওয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ছাট ঘরে এসে ঢুকলো সোঁ সোঁ করে যেন।

সূর্য-ঘরের কোণে বোধহয় কয়েকটা চামচিকে ছিল, ফর ফর করে মাথার উপরে উড়তে শুরু করে।

থমকে দাঁড়িয়েছিল নিজের অজ্ঞাতেই হীরক এবং হাতের পিস্তলটা শক্ত মুঠিতে ধরেছিল।

কড় কড় করে প্রচণ্ড শব্দে বাইরে বাজ পড়লো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নীল আলোর ঝাপটা সূর্য-ঘরের ভিতরে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো।

চকিতের জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে একেবারে কয়েক হাত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কে একজন।

কে? এক পা এগিয়েছ কি গুলি করবো।

গুলি করবেন না মিঃ চৌধুরী! গুলি করবেন না—

কে! কে তুমি?

আমি ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়—

সো ইন্‌স্‌পেক্টর। ইউ হ্যাভ কাম! তুমিই তাহলে এতক্ষণ আমাকে ছায়ার মতো পিছনে পিছনে ফলো করে এসেছ—

হ্যাঁ, আমি। বাট ফর হেভেন্‌স্ সেক ডোন্ট ফায়ার। গুলি করবেন না।—

গুলি করবো না! এতবড় শত্রুকে আজ শেষ মুহূর্তে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও গুলি করবো না!

না, না,—শুনুন, শুনুন—

এগিয়ো না ইন্‌স্‌পেক্টর। এক পা আর এগিয়ো না।

এগোব না। শুনুন, মিঃ চৌধুরী, আপনাকে ধরবার জন্ত এখানে আমি আসি নি—

বটে! ধরবার জন্ত আসো নি—তবে কিজন্ত এসেছ ইন্‌স্‌পেক্টর?

এখনো সময় আছে—এই মুহূর্তে মণিমঞ্জিল থেকে আপনি পালান—

সুনন্দর কথায় হীরক যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল। থমকে গেল।

জেল থেকে পালাবার পর এই ক'টা দিন আপনাকে কেবল ঐ কথাটা বলবার জন্তই খুঁজেছি। এবং মণিমঞ্জিলে আপনি আসতে পারেন তাই ভেবেই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। প্লীজ্—দেরি করবেন না, আপনি এই মুহূর্তে পালান।

পালাবো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—পালান। চলে যান গঙ্গার ঘাটে শিবমন্দিরের কাছে। সেখানে নৌকা আছে দেখবেন—সেই নৌকার মাঝিকে যেখানে আপনি পৌঁছে দিতে বলবেন—সে আপনাকে পৌঁছে দেবে—

হ্যাঁ, পৌঁছে দেবে। একেবারে সোজা থানায়, তাই না ইন্‌স্‌পেক্টর।

বিশ্বাস করুন আপনি, আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

আমি পালিয়ে যাতে যেতে পারি সেই সুযোগটাই করে দেবার জন্ত তুমি মণিমঞ্জিলের পাশে ওৎ পেতে ছিলে আমারই প্রতীক্ষায়। হউ ওয়াণ্ট মি টু বিলিভ দ্যাট্? বিশ্বাস করতে বলো কথাটা? তুমি কি মনে করেছ ইন্‌স্‌পেক্টর আমি এতই বোকা? সাচ্ এ ফুল অ্যাম আই?

মিঃ চৌধুরী, মিথ্যা সময় নষ্ট করে আপনি আপনার সর্বনাশ ডেকে আনছেন। সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি তাই চাই—

কিন্তু কেন বলে তো ইন্‌স্‌পেক্টর? যাকে ধরবার জন্ত এতদিন এত কষ্ট করেছ, তাকে ছেড়ে দেবার জন্ত এত আগ্রহ কেন তোমার?

কেন?

হ্যাঁ, কেন?

হঠাৎ যেন হীরকের প্রশ্নটায় থতমত খেয়ে যায় সুনন্দ।

তাই তো, কেন? এবার কি জবাব দেবে সে?

কি বল? হীরক আবার বলে।

ভেবে দেখুন মিঃ চৌধুরী, আজো আপনার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, সন্তান আছে—আপনি ধরা পড়লে তাদের কি হবে?

তারজন্য তোমারই বা এত দরদ কেন ?

সবাই জানে—আপনি হয়তো জানেন না—সবাই জানে আপনি মঙ্গল, আপনি যমুনাপ্রসাদ, কিন্তু আপনি যে হীরক চৌধুরী সেকথা একমাত্র আমি ছাড়া পুলিসের দ্বিতীয় কেউ জানে না। এখানকার সবাই জানে হীরক চৌধুরী আপনি গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছেন, কিন্তু আজ যখন জানতে পারবে সবাই—হীরক চৌধুরীই মঙ্গল, হীরক চৌধুরীই যমুনাপ্রসাদ, তখন কোথায় যাবে আপনার স্ত্রীর সম্মান—আপনার একমাত্র ছেলের গৌরব, আপনাদের এতবড় বংশ-মর্যাদা—

সুনন্দর কথায় সহসা যেন তার চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। নিষ্ঠুর সত্যটা যেন মুখোমুখি সামনে এসে দাঁড়াল মুহূর্তে।

সত্যিই তো! কথাটা তো মিথ্যা নয়!

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে সংশয় আবার এসে মাথা তোলে।

এ যে অবিশ্বাস্য! পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায় তার মতো একজন ক্রিমিন্যালকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিচ্ছে, আর বেনই বা দিচ্ছে—এ অবিশ্বাস্যই নয় শুধু, কল্পনাতীত।

সুনন্দ আবার বলে, কেন দেরি করছেন? যান, পালিয়ে যান। আপনার মা, স্ত্রী ও সন্তানকে রক্ষা করবার তো আপনার আজ আর কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাদের যে গৌরব, যে মর্যাদা আজ ধুলোয় মিশিয়ে যেতে বসেছে—সেটুকু অন্ততঃ আপনি আজ রক্ষা করুন। যে ব্যথা আর লজ্জা নিয়ে তারা আজো বেঁচে আছে, তার উপরে আর আঘাত দেবেন না। যান। যান—এখান থেকে যান।

কিন্তু—

ভয় নেই আপনার, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনাকে পালাতে দিতেই আমি চাই। এ আমার যুক্তির বাইরে, নীতির বাইরে—তবু—তবু আপনি পালান।

যাবো?

হ্যাঁ, আর দেরি করবেন না, যান।

কিন্তু—

আঃ, কেন এখনো দেরি করছেন, যান, যান—

কে যেন ঠেলেই বের করে দেয় হীরককে সূর্য-ঘরের সিঁড়ির দিকে। এগিয়ে যায় হীরক।

অবশেষে মণিমঞ্জিলের পিছনের দ্বার পথ দিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই হীরক বের হয়ে গেল।

ক্ষণকাল সেইদিকে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো সুনন্দ, তারপর কবজার খিল তুলে দিতে যাবে একটা তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজ সুনন্দর কানে এলো।

সর্বনাশ! এই যে পুলিসের হুইসেল!

তবে কি! তবে কি তারা এসে গিয়েছে!

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না সুনন্দ।

সোজা সূর্য-ঘরে গিয়ে ওঠে তরতর করে।

সূর্য-ঘরের জানালা-পথে উঁকি দেয়।

পুলিসের সার্চলাইট চারিদিকে অনুসন্ধানী আলো ফেলছে।

সেই আলোতেই দেখতে পেল সুনন্দ মণিমঞ্জিলের সদরে পুলিসের গোটাচারেক গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

মুহূর্তকাল সূর্য-ঘরে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবলো—তারপরই সুনন্দ আবার তরতর করে সূর্য-ঘর থেকে নেমে এলো।

নীচে এসে গাড়ি-বারান্দার বড় একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

পুলিসের দল গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই ফায়ার করলো সুনন্দ।

থমকে দাঁড়ায় ওরা।

মিঃ মুখার্জী তখন নির্দেশ দেন—গুলি করতে করতে এগিয়ে চল—ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলিবৃষ্টি হলো।

উপরে ততক্ষণে এদিকে মহাশ্বেতার ঘুম ভেঙে গিয়েছে, কাঞ্চনারও ঘুম ভেঙে গিয়েছে গুলির শব্দে।

কাঞ্চনাই ছুটে মহাশ্বেতার ঘরে আসে, মা, মা—গুলি! গুলির শব্দ আসছে কেন?

বাবলু, বাবলু কোথায় বৌমা? উদ্বেগাকুল কণ্ঠে শুধান মহাশ্বেতা।

ঘুমুচ্ছে—

নিয়ে এসো, নিয়ে এসো তাকে।

কেবলই দুম্ দুম্ গুলির শব্দ আসছে তখন চারিদিক থেকে।

মিঃ মুখার্জী হাতের বিরাট টর্চের আলো ফেললেন সামনের দিকে।

চকিতে সরে গেল সুনন্দ।

মিঃ মুখার্জী দেখলেন কে একজন চকিতে একটি থামের আড়াল থেকে অন্য থামের আড়ালে চলে গেল।

মিঃ মুখার্জীর হাতের পিস্তল আবার গর্জে উঠলো। দুদুম!

সুনন্দর হাতের পিস্তলও জবাব দিল।

আর ঠিক সেইসময়।

ঝড়-জলের মধ্যে দিয়ে পুলিসের একটা জীপ কলকাতা থেকে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছিল শ্রীরামপুরের দিকে।

জীপের মধ্যে ছিলেন পুলিসের বড়কর্তা মিঃ সান্যাল ও কালীপ্রসন্ন।

কালীপ্রসন্ন শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারেন নি।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়।

কিন্তু সুনন্দর বাসায় এসে যখন শুনলেন, সুনন্দ ছুটি নিয়েছে, কিছুদিন থেকেই সে কলকাতায় নেই, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন।

সারদাও বলতে পারল না সুনন্দ কোথায় গিয়েছে?

কেবল সে বললে, খোকাবাবু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন পাগলের মতো কিছুদিন থেকে মনে হয়। ভাল করে কথাবার্তা বলে না—বাড়িতেও আসে না।

কি করবেন প্রথমটায় কালীপ্রসন্ন বুঝতে পারেন না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে মিঃ মুখার্জী সুনন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি হয়তো তার কোন খবর দিতে পারেন।

ফোন করলেন তখুনি মিঃ মুখার্জীকে।

কিন্তু শুনলেন, তিনি বিশেষ কাজে লালবাজারে গিয়েছিলেন।

লালবাজারে তখন ফোন করলেন আবার কালীপ্রসন্ন। কিন্তু ফোন-কানেকশন পেলেন না।

কেবলই মনে হতে থাকে কালীপ্রসন্নর, হঠাৎ ছুটি নিতে গেল কেন সুনন্দ? আর ছুটি নিয়ে সে গেলই বা কোথায়?

ঘণ্টা দুই বাদে আবার কালীপ্রসন্ন মিঃ মুখার্জীর বাড়িতে ফোন করলেন।

শুনলেন বাড়িতে তখনো ফেরেন নি মিঃ মুখার্জী।

তাঁর বাড়ি থেকে বললো, আপনি একবার মিঃ সান্যালের বাড়িতে ফোন করুন তো! উনিও একটু আগে ওঁকে খোঁজ করছিলেন। হয়তো মিঃ সান্যালের যাবেন মিঃ মুখার্জী।

এবারে কালীপ্রসন্ন মিঃ সান্যালকে ফোন করলেন।

মিঃ সান্যাল ফোন ধরলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলেন কালীপ্রসন্ন সুনন্দ শ্রীরামপুরে।

চমকে ওঠেন কালীপ্রসন্ন, শ্রীরামপুরে কেন গেল সুনন্দ? জিজ্ঞাসা করেন।

সরকারী কাজে গিয়েছে সে সেখানে।

কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম সে ছুটিতে।

হ্যাঁ, ছুটিতেই, তবে—মিঃ সান্যাল কথাটা ঠিক ভাঙলেন না।

কালীপ্রসন্ন তখন জিজ্ঞাসা করলেন. একবার তিনি মিঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন কি না।

মিঃ সান্যাল বললেন, বেশ তো, কাল আসুন—

কাল নয় মিঃ সান্যাল, এখুনি একবার আমি দেখা করতে চাই—সুনন্দ সম্পর্কে কতকগুলো কথা আপনাকে বলতে চাই—বিশেষ জরুরী।

বেশ। আসুন!

সেই রাত্রেই সংক্ষেপে যখন সুনন্দ ও হীরকের ব্যাপারটা বলেছেন কালীপ্রসন্ন মিঃ সান্যালকে, শ্রীরামপুর থেকে জরুরী ফোন এলো।

রণবীরের ফোন।

সে বললে, আপনাকে, ঘণ্টাখানেক থেকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করছি স্যার। যমুনাপ্রসাদ কিছুক্ষণ পূর্বে মণিমঞ্জিলে এসে প্রবেশ করেছে।

ইন্‌স্পেক্টর সুনন্দ রায় কোথায়?

সে-ও ওকে অনুসরণ করে মণিমঞ্জিলেই ঢুকেছে! আমি ইতিমধ্যে ওখানকার থানা-অফিসারকে সংবাদটা দিয়ে দিয়েছি। মিঃ মুখার্জীকেও সংবাদ দিয়েছি।

ঠিক আছে। ফোনটা রেখে দিলেন মিঃ সান্যাল।

কালীপ্রসন্ন শুধান, কিসের সংবাদ এলো?

ভাল খবর। হীরক মণিমঞ্জিলে ঢুকেছে—

আর সুনন্দ?

সে-ও তাকে অনুসরণ করেছে।

আমি চলি—কালীপ্রসন্ন উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।

কোথায় চললেন?

শ্রীরামপুরে।

অপেক্ষা করুন, আমিও যাবো।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই কালীপ্রসন্নকে নিয়ে জীপে করে মিঃ সান্যাল শ্রীরাম-পুরের দিকে রওনা হলেন।

হঠাৎ অতর্কিতে একটা গুলি এসে সুনন্দর তলপেটে বিদ্ধ হতেই সুনন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সুনন্দ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন মিঃ মুখার্জী এবং বারান্দার আলো জেলে দিলেন। এবং আলোতে গুলিবিদ্ধ সুনন্দর দিকে তাকিয়ে মিঃ মুখার্জী চমকে উঠলেন, এ কি—এ যে ইন্‌স্‌পেক্টর রায়!

ইয়েস মিঃ মুখার্জী—আমি রায়।

আপনি, আপনি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন?

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

সব বলবো। আমাকে, আমাকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারেন আগে নিয়ে চলুন।

কোথায়? কোথায় যাবেন?

যেখানে হোক। যেখানে হোক নিয়ে চলুন। এ বাড়ির লোকেরা জানবার আগে এখান থেকে দয়া করে আমাকে যেখানে হোক সরিয়ে নিয়ে যান।

রণবীরও ঐ দলে ছিল।

সে-ই বলে, মিঃ মুখার্জী, তাড়াতাড়ি ওকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার—

মিঃ মুখার্জী ঘটনার আকস্মিকতায় ঐ প্রয়োজনীয় কথাটাই এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন, রণবীরের কথায় বললেন, ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি। তাড়াতাড়ি সেই ব্যবস্থাই কর রণবীর—

রণবীরই ছুটে গিয়ে জীপ নিয়ে এলো এবং আহত সুনন্দকে যখন জীপে তোলা হচ্ছে, মহাশ্বেতা এসে সেখানে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যে ভৃত্যের মারফৎ সংবাদটা তাঁরও কানে গিয়েছিল।

॥ একুশ ॥

মহাশ্বেতা যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, রণবীর আর একজন পুলিস আহত সুনন্দকে ধরাধরি করে জীপের দিকে নিয়ে চলেছে।

আহত রক্তাক্ত সুনন্দকে দেখে প্রথমটায় মহাশ্বেতা কিছুই বুঝতে পারেন না।

কয়েকটা মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হয় না।

সুনন্দ, সুনন্দ এখানে কেন? আর রক্তাক্ত, আহতই বা সে কেন?

তবু পায়ে পায়ে যেন নিজের অজ্ঞাতেই ষ্ট্রেচারটার সামনে এগিয়ে আসেন মহাশ্বেতা।

অস্ফুট কণ্ঠে থেকে তাঁর বের হয়, সুনন্দ!

সুনন্দ হঠাৎ যেন পাগলের মতোই চিৎকার করে ওঠে, আঃ, কি করছ রণবীর—নিয়ে চল, তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে চল—

ওরা তাড়াতাড়ি সুনন্দকে নিয়ে এগিয়ে যায়, একটু যেন বিস্মিত হয়েই।

মহাশ্বেতা তবু এগিয়ে আসেন, একটা কথা সুনন্দ—

নিয়ে চল, আমাকে নিয়ে চল—সুনন্দ আবার চেঁচিয়ে ওঠে।

রণবীরের নির্দেশে বাহকেরা ষ্ট্রেচারটা বহে নিয়ে এগিয়ে যায় গেটের দিকে।

মহাশ্বেতা হতভম্বের মতোই যেন দাঁড়িয়ে থাকেন।

ব্যাপারটা কিছুই যেন তাঁর বোধগম্য হয় না।

সুনন্দ আহত হলো কি করে!

এতক্ষণ যে কারণে মহাশ্বেতা কাঠ হয়ে ছিলেন, হীরকই হয়তো ফিরে এসেছে এবং তারই সঙ্গে পুলিসের যুদ্ধ চলেছে—তাহলে তাঁর অনুমান ও আশঙ্কা ভুল, মিথ্যা!

কিন্তু সুনন্দ কি করে এখানে এলো আর কি করেই বা অমনভাবে আহত হলো?

মহাশ্বেতা পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আহত সুনন্দকে নিয়ে মিঃ মুখার্জী চলে গেলেন জীপে তাকে তুলে নিয়ে।

ওরা বের হয়ে যাবার মিনিট কুড়ি বাদেই মিঃ সান্যালের জীপ এসে ঢুকলো মণিমঞ্জিলে।

কালীপ্রসন্ন লাফিয়ে নামলেন জীপ থেকে। নেমেই সোজা নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বারান্দার দিকে প্রায় ছুটে আসেন কালীপ্রসন্ন, সুনন্দ—সুনন্দ—

মহাশ্বেতা তখনো সেখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

এই যে বৌদি, সুনন্দ, সুনন্দ কোথায়?

কে?

চমকে তাকান মহাশ্বেতা।

আমি। চিনতে পারছেন না আমাকে বৌদি, আমি কালীপ্রসন্ন—

ঠাকুরপো !

হ্যাঁ—সুনন্দ, সুনন্দ কোথায় ?

সুনন্দ !

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কোথায় ? কোথায় সে ?

একটু আগে যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা।

কারা ? কারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল আর কেনই বা নিয়ে গেল ?

পুলিসের লোকেরা, বন্দুকের গুলিতে সে আহত হয়েছিল।

সেকি !

হ্যাঁ—

আর হীরক ? হীরককে তারা ধরতে পারে নি ?

না। কিন্তু সে—

সে-ও তো এখানে আজ রাত্রে এসেছিল ?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ঠাকুরপো।

কি আর বুঝবেন ? আমি এই আশংকাই করেছিলাম।

ঠাকুরপো !

এখুনি চলুন হাসপাতালে।

হাসপাতালে !

হ্যাঁ—সুনন্দকে আপনি মা হয়েও চিনতে পারলেন না বৌদি—

কি বলছেন ঠাকুরপো ? চেঁচিয়ে ওঠেন মহাশ্বেতা।

কিন্তু আর দেরি করবেন না—আগে চলুন হাসপাতালে—

ঠাকুরপো—সব কথা আমাকে খুলে বলুন—

কি বলবো আর বৌদি ! চিনতে পারলেন না, মা হয়েও নিজের সন্তানকে চিনতে পারলেন না ! ও আপনার সেই জলে-ডুবে-যাওয়া ছোট ছেলে বাচ্চু। মরে নি সেদিন সে জলে ডুবে, আমিই তাকে বাঁচিয়েছিলাম।

বাচ্চু ! আমার বাচ্চু ! না—না, এ আপনি কি বলছেন ?

হ্যাঁ—সেদিন যে প্রশ্ন আপনি করেছিলেন কিন্তু জবাব দিই নি আমি সত্যিই আমি আপনাদের জলে ডুবিয়ে সে রাত্রে হত্যা করতে চেয়েছিলাম সবাইকে একসঙ্গে।

মহাশ্বেতা একেবারে যেন বোবা।

সব কথা আপনি পরে শুনবেন। বাচ্চুকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। এতদিন ওকে ওর সত্য পরিচয় দিই নি, কিন্তু যেদিন শুনলাম হীরক ধরা পড়েছে—ভয়

হলো এবার তো সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে—তাছাড়া তাই হবে ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ—তাই কাশী থেকে ছুটে এসে সব কথা ওকে জানাই—

বুঝতে পেরেছি। এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি ঠাকুরপো। আমাদের কলঙ্ক থেকে বাঁচানোর জন্ত তাই সে ছুটে এসেছিল সেদিন এখানে—হতভাগিনী আমি—মা হয়েও তাকে চিনতে পারলাম না। এখন বুঝতে পারছি—নিশ্চয়ই হীরক এসেছিল, তাকে বাঁচাতে গিয়েই সে নিজে আহত হয়েছে। চলুন ঠাকুরপো। তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন—

হাসপাতালে যখন ওরা এসে পৌছাল, সুনন্দকে তখন অপারেশন-টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হচ্ছে।

জ্ঞান আছে বটে সুনন্দর, কিন্তু বাঁচবার আশা খুব কম।

মহাশ্বেতা এসে কাঁপতে কাঁপতে সুনন্দর সামনে দাঁড়ালেন—

সুনন্দ!

কে?

ওরে, কেন আমাকে এতদিন তোর পরিচয় দিস নি বাবা?

মা!

কেন বাবা!

দাদা—দাদাকে কি ওরা ধরতে পেরেছে?

সে হতভাগার কথা আর বলিস না—বলিস না—

দাদা পালাতে পেরেছে তো মা?

সুনন্দ!

মা!

ডাক্তার এসে বললেন, মহাশ্বেতা দেবী, আমরা ওকে এবার অপারেশন করব। সরুন—

সুনন্দর নির্দেশে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই কানে এসেছিল হীরকের বন্দুকের গুলির শব্দ।

এবং সে শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

দুম—দুদুম—

অনবরত গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সামান্য যে সংশয়টুকু এতক্ষণ হীরকের মনে ছিল সেটাও যেন ঐ মুহুর্মুহু গুলির শব্দে মন থেকে মুছে যায় তার।

ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ তাকে সত্যিই বাঁচাতেই চেয়েছে।

কিন্তু কেন! কেন সে এ কাজ করল? কোন স্বার্থে!

আর এক পা-ও এগোয় না হীরক।

সেইখানেই গঙ্গার ধারে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

তার চিরশত্রু ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ তাকে বাঁচালো।

এও কি সম্ভব!

ক্রমশঃ একসময় গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়।

আর হীরক মণিমঞ্জিলের দিকেই আবার ফেরে, পিছনে দরজা দিয়ে চোরের মতো ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে—কালীপ্রসন্ন তখন মহাশ্বেতার সঙ্গে কথা বলছেন।

বারান্দার একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথাই সে শোনে।

চমকে ওঠে কালীপ্রসন্নর কথা শুনতে শুনতে, এ সে কি শুনছে!

সুনন্দ—ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ তার ভাই!

আপন সহোদর!

তাই—তাই সে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

সুনন্দ, সুনন্দ তার ভাই! বুকটার মধ্যে যেন কাঁপছে।

সে—সেই তার একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ হলো!

হাসপাতালের ওয়েটিং-রুমে মিঃ মুখার্জী, মিঃ সান্যাল সবাই বসে ছিলেন।

মিঃ সান্যাল সব কথা বলেছেন মিঃ মুখার্জীকে।

বাইরে একটা খুট্ খুট্ শব্দ শোনা যায়।

কে যেন আসছে।

যমুনাপ্রসাদ লাঠিতে ভর দিতে দিতে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

কে? মিঃ মুখার্জী লাফিয়ে ওঠেন, যমুনাপ্রসাদ—

না, মিঃ মুখার্জী—আমি যমুনাপ্রসাদও নই, মঙ্গলও নই। আমি হীরক চৌধুরী। কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর সুনন্দ রায়, সে—সে কেমন আছে?

মিঃ মুখার্জী ও মিঃ সান্যাল বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে হীরকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাঁরা কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন!

কথা বলছেন না কেন আপনারা ? আমি জানি সে আহত—তাকে আপনারা এখানে নিয়ে এসেছেন। কেমন আছে সে ?

ওঁরা তবুও নির্বাক।

হীরক আর দাঁড়ায় না, লাঠিতে ভর দিতে দিতে অপারেশন থিয়েটারের দিকে এগিয়ে যায়।

মিঃ মুখার্জী হীরকের পিছনে পিছনে এগিয়ে যান, হীরক কিন্তু ফিরেও তাকায় না।

সোজা গিয়ে অপারেশন থিয়েটারের কাচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

সুনন্দ !

এ্যানেসথেসিয়া দেবার জন্য এ্যানেসথেটিটে তখন প্রস্তুত হচ্ছে।

সুনন্দ !

এগিয়ে এসে একেবারে দাঁড়ায় হীরক অপারেশন টেবিলের সামনে।

কে ? এ কি—আপনি, আপনি ফিরে এলেন কেন ?

প্রায়শ্চিত্ত করতে।

প্রায়শ্চিত্ত ?

মিঃ মুখার্জী এসে কাঁধের উপর হীরকের একটা হাত রাখলেন পিছন থেকে, মিঃ চৌধুরী—

ফিরে তাকাল হীরক।

নার্সরা এগিয়ে আসে।

চলুন, বাইরে যাই আমরা—

অপারেশন টেবিলের 'পরে শুয়ে শুয়েই তাকিয়ে থাকে সুনন্দ হীরকের মুখের দিকে।

হীরকও তাকিয়ে আছে সুনন্দর মুখের দিকে।

সুনন্দ !

দাদা—